সব পেয়েছির দেশে

বুদ্ধদেব বসু

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ

অগস্ট, ১৯৪১—কবিতা ভবণ।

প্রচ্ছদ ঃ

রামানন্দ বন্দোপাধ্যায়।

প্রকাশক ঃ

ভোলানাথ দাস

সপ্তর্ষি,

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক ঃ

কনক কুমার বসুঠাকুর

সুমুদ্রণী

৪/৫৬এ, বিজয়গড়, কলিকাতা-৭০০ ০৩২

উৎসর্গ

অমিয় চক্রবর্তী

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এবারে শান্তিনিকেতনে থাকতে-থাকতেই এ-বইটির কল্পনা আমার মনে আসে, এবং কলকাতায় ফেরবার অল্প ক'দিন পরেই এটি লিখতে আরম্ভ করি। এর শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের যে-চিঠিটি আছে সেটি এ-বইয়ের অন্তর্গত করবার অনুমতি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

বইটি রবীন্দ্রনাথের হাতে দিতে পারলে ধন্য হতাম, আমার এ-সামান্য উপহার তিনি হয়তো খুশি হ'য়েই গ্রহণ করতেন। কিন্তু তা আর হ'লো না। এবারের শ্রাবণ-পূর্ণিমা এলো আমাদের সর্বনাশ নিয়ে। এ-বইয়ের উন্মেষ যত বড়ো আনন্দে, তার চেয়েও বড়ো দুঃখের দিনে এর জন্ম হ'লো। শান্তিনিকেতন যাঁদের প্রিয়, রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য রইলো আমার আনন্দ-বেদনা-মেশা এই রচনা।

বইয়ের সুন্দর প্রচ্ছদপদটি এঁকে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

শ্রাবণ, ১৩৪৮

বইটি কবিতা ভবণ থেকে স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৪১ এর অগস্টে, দ্বিতীয় মুদ্রণ ও প্রকাশ করে কবিতা ভবণ তারপরেও বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বইটি বাজারে অনুপস্থিতি। শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসু প্রকাশের অনুমতি দেওয়ায় বইটি আবার বাজারে বেরুল। প্রথম সংস্করনের প্রচ্ছদটি মুদ্রণ-যোগ্যভাবে উদ্ধার করতে না পারায় নতুন করে প্রচ্ছদ করতে হয়েছে, যেটি করে দিয়েছেন শ্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায়।

সূচী

শান্তিনিকেতন

এই বই এর ছত্রেছত্রে রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি, সেকালের শান্তিনিকেতনের মোহময় রূপ। সেই শান্তি-নিকেতন যেখানে গ্রীষ্ম, বর্ষা, কোনার্ক শ্যামলী শালবীথি আম্রকুঞ্জ মিলেমিশে একাকার, যেখানে অপরূপ দেহকান্তি আর বাক বৈদগ্ধ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মধ্যমণি।

পূর্বস্মৃতি

এই গরমে শান্তিনিকেতন? পাগল নাকি! অতিথিশালা বন্ধ, জলাশয় শুকনো, তীব্রতাপে অসহনীয় দিন—এমনি নানা কথা কানে এলো। কবি অসুস্থ, দেখা হয় কি না হয়। গরমের কষ্ট, জলের কষ্ট যা-ই হোক্, কবির সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্যেই আমাদের যাওয়া। অনেকদিন তাঁকে দেখি না। ১৯৩৮-এর ঈস্টরে শান্তিনিকেতনে শেষ বার গিয়েছিলুম, তখন রবীন্দ্রনাথ সদ্য রোগমুক্ত। আমরা ছিলুম 'পুনশ্চ'তে, কবির বাসা তখন 'শ্যামলী'। 'শ্যামলী'র পিছনে নিচু একটি আমগাছের ছায়ায় বেতের চেয়ারে রোজ সকালে তিনি বসতেন, সামনের টেবিলে সকালের ডাক জ'মে উঠতো, ছেঁড়া দু'একটি লেফাফা ঝরা পাতার সঙ্গে মাটিতে এসে মিশতো—আমরা সে-সময়ে তাঁর পাশে এসে বসতুম। সে-সময়ে সমর সেন ছিলেন সেখানে, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন; তাঁরা ছিলেন আমাদের সব-সময়ের সঙ্গী। আমরা মাঝ-রাত্তিরে পৌঁছিয়েছিলুম, ষ্টেশন থেকে ট্যাক্সি এসে গেস্ট-হাউসের দরজায় দাঁড়াতেই টুক ক'রে দোতলার একটি জানালা খুলে গেলো; প্রথমে বেরুলো সমরবাবুর গেঞ্জি-পরা উর্ধ্বাঙ্গ, তারপর কামাক্ষীপ্রসাদের মাথাও দেখা দিলো—তারপর সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেলো, হারিকেন লণ্ঠন হাতে কামাক্ষীপ্রসাদ নেমে এলেন, সমরবাবুকে পাওয়া গেলো সিঁড়ির মাঝ-রাস্তায়। সকলে মিলে উপরে উঠে এলুম তাঁদের ঘরটিতে। ঘটনাটি বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে মিলনের সে-মুহূর্তটি যে কী মধুর লেগেছিলো আজও তা মনে করতে ভালো লাগে। জীবনের বড়ো বড়ো ঘটনাগুলি কোথায় তলিয়ে যায়, এমনি নানা ছোটো-ছোটো

মুহূর্ত নিয়েই জাদুকর স্মৃতি গ'ড়ে ওঠে ও বেড়ে ওঠে।

স্তব্ধ রাত, অল্প জোচ্ছনায় চারদিকের গাছপালা কালো হ'য়ে ফুটে উঠেছে। মনে আছে, প্রথমেই যেটা মনে লেগেছিলো সেটা পাখির ডাকাডাকি। আমাদের অনভ্যস্ত শহুরে কানে চাঁদেপাওয়া পাখির অশান্ত কাকলি অদ্ভুত লাগছিলো—পৃথিবীতে সত্যি-সত্যি যে পাখি ডাকে তা যেন ভুলেই গিয়েছিলুম। তবে পৃথিবীতে যে খিদে পায় সেটা ভোলবার কারণ ছিলো না। ম্যানেজরকে জিজ্ঞাসা করলুম আহার্য কিছু মিলবে কিনা; তিনি মাথা নাড়লেন। চা? খানিক পরেই কয়েক পেয়ালা চা এসে হাজির। জ্যোছনা-ফোটা খোলা ছাদে ব'সে খুব ভালো লাগলো চা; মনের তখন এমন একটি অদ্ভুত আনন্দিত অবস্থা যে নৈশভোজনের অভাবটা একটুও টের পেলুম না। সমরবাবু বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ আপনাদের জন্য "পুনশ্চ" ঠিক ক'রে রেখে কাল আপনাদের অপেক্ষা করছিলেন, আপনারা এলেনও না, খবরও পাঠালেন না, বোধ হয় তিনি রাগ করেছেন। একটা টেলিগ্রাম করা আপনাদের উচিত ছিলো।' উচিত ছিলো নিশ্চয়ই; কিন্তু কর্তব্যপালনে এই ত্রুটির জন্য যথেষ্ট লজ্জিত বোধ করতে পারলুম না, মনটা এতই ভালো লাগছিলো। ঘরের খাট দুটি আমরা দখল করলুম; আর দুই বন্ধু বারান্দায় সরু বিছানা পেতে অসম্ভব নিচু ক'রে টাঙানো মশারির তলায় ঢুকলেন, সেই মশারিটার চেহারা কখনো ভুলবো না। আমাদের মৃদু গুঞ্জনে চারদিককার গভীর স্তব্ধতায় যা একটু চিড় ধরেছিলো, আমরা শুতেই আবার তা সম্পূর্ণ, নিটোল হ'য়ে উঠলো; পাখির ডাক শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে এক পেয়ালা চা খেয়ে বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় উত্তরায়ণের এক পরিচারক শাদা কাপড়ে ঢাকা একটি ট্রে এনে আমাদের সামনে রাখলো। ঢাকনা খুলে দেখি বিচিত্র ও বিস্তর সুখাদ্যে ট্রে-টি ভর্তি। কাল রাত্রে আমাদের যে খাওয়া হয়নি সে-খবর যে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছিয়ে গেছে এবং সেই সঞ্চিত ক্ষুধা

নিবারণের বিপুল আয়োজন যে সঙ্গে-সঙ্গেই প্রস্তুত, এতে অবাক যেমন হলাম, খুশিও হলাম তেমনি। খাবার সামনে নিয়ে ব'সে থাকা আমার ধাত নয়, তক্ষুনি লেগে গেলাম কাজে, বন্ধুদেরও উৎসাহের অভাব দেখলুম না। মক্ষিরানিকে অনেক ডাকাডাকি ক'রেও পাওয়া গেলো না, তিনি ছিলেন স্নানের ঘরে, এবং স্নানের পরেও প্রসাধনে অনর্থক অনেকগুলো সময় নষ্ট করলেন। ফল এই হ'লো যে অমন চমৎকার সন্দেশগুলোর আধখানাও তাঁর জন্যে বাকি রইলো না—সত্যি বলছি, আমার কোনো দোষ নেই—বন্ধুদেরই উচিত ছিলো তাঁর জন্যে আলাদা ক'রে রাখা, কিন্তু আজকালকার যুবকদের শিভালরিবোধের বড়োই অভাব। মোটের উপর মক্ষিরানি সামান্যই খেলেন, আহার্য বস্তুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা একটু অদ্ভুত। তিনি যে খান না বা খেতে ভালো-বাসেন না তা নয়; কিন্তু এটা সর্বদাই লক্ষ্য করেছি যে যক্ষুনি খাবার প্রস্তুত হয়, তক্ষুনি তিনি একটা অত্যন্ত জরুরি কাজে ব্যাপৃত হ'য়ে পড়েন, কিংবা সারা বাড়িতে ডাকাডাকি ক'রেও তাঁকে পাওয়া যায় না। চায়ের ট্রে যেই দিয়ে গেলো, অমনি তিনি ফেরিওলা ডেকে ছিট কাপড় কিনতে বসলেন; টেবলে যেই ভাত আনা হ'লো তিনি ব'সে গেলেন শেলাই করতে। অসহিষ্ণু পুরুষের চ্যাঁচামেচি শুধু নয়, খাদ্য-পানীয়ের আহ্বানও তখনকার মতো তাঁর কাছে নির্মমভাবে উপেক্ষিত; আবার হয়তো কোনো অসম্ভব অসময়ে তাঁর ক্ষুধাবোধ হবে, তখন আহার্যের সন্ধানে হাৎড়ে ফিরে প্রায়ই হতাশ হ'তে হয়। আমরা পুরুষরা স্থূল প্রকৃতির জীব, খিদের সময় খাবার কাছে পেলেই গোগ্রাসে খেতে আরম্ভ করি, পেট যতক্ষণ না ভরে থামি না এবং পেট ভরলেই থামি, ঘড়ির কাঁটায় পরের বারের খাওয়ার সময় না-হওয়া পর্যন্ত কিছু আর মুখে দিতে চাইনে। কিন্তু মক্ষিরানি রেখে-রেখে চেখে-চেখে খেতে ভালোবাসেন, সময়ের শাসন মানেন না, যথাসময়ে আহারে তাঁর উদাসীনতা, কিন্তু অযথা অসময়ে একটু ফল, মিষ্টি কি নেহাৎ আচার-টাচারেও আপত্তি দেখি না।

যা-ই হোক্, সেদিন সকালবেলাকার আশ্চর্য ভোজের অতি সামান্য অংশই তাঁর কপালে জুটেছিলো। এ থেকে আর একটা জিনিশ প্রমাণ হচ্ছে এই যে সুখাদ্যে কবিদের রুচির অভাব নেই, কারণ ট্রে-র ঢাকনা প্রথম তুলে যদিও মনে হয়েছিলো, বাপরে, এত খাবে কে! তবু শেষ পর্যন্ত বিশেষ যে কিছু বাকি ছিলো এমন মনে পড়ে না।

খানিক পরেই আমরা বদলি হলুম 'পুনশ্চ'-তে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি প্রথম কথা বললেন, 'যেমন তোমরা নিশাচর, তেমনি শাস্তি পেলে তো। কাল রাত্রের উপবাসটা কেমন লাগলো? যদি কখনো এখানকার ভ্রমণকাহিনী লেখো আশা করি ঐ কথাটা বাদ দিয়ে যাবে।'

কবি তখন অল্পদিন রোগশয্যা ছেড়ে উঠেছেন, কিন্তু রোগের কোনো গ্লানি আর নেই। সেই চিরপরিচিত উজ্জ্বল মহান মুখশ্রী, সেই তীক্ষ্ণ আরক্ত-অপাঙ্গ চোখ, সেই উদার গম্ভীর স্বচ্ছ ললাট। আমার বরাবরই মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের চোখ যেন কোনো মোগলসম্রাটের চোখের মতো, তাতে তাঁর কবিপ্রতিভা যত না ধরা পড়ে তার চেয়ে এ কথাটাই বেশি ফোটে যে তিনি স্বভাবতই রাজা। তাঁর চোখের দিকে তাকাতে যেন ভয় করে। কথা বলবার সময় শ্রোতাদের মুখের দিকে তিনি অল্পই তাকান, কিন্তু যখন তাকান তখন চোখ নামিয়ে নিতে ইচ্ছে করে, মনে হয় এই দৃষ্টির বাণ বুঝি সরাসর হৃদয়ের অগম গহনে গিয়ে বিঁধবে। অন্যপক্ষে তাঁর হাসিটি মানবিক মধুরতায় ভরা, শ্বেতশ্মশ্রুর আবরণ ঠেলেও সে-হাসি বড়ো সুন্দর হ'য়ে ফোটে, তা দেখলে মনের মধ্যে ভারি একটি আরাম ও আশ্বাস পাওয়া যায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রূপকে এ রকম বিশ্লেষণ করতে যাওয়াই হয়তো ভুল। তিনি সুন্দর কোনো বিশ্লিষ্ট অবয়বে বা ভঙ্গিতে নয়, কিংবা তাঁর দীর্ঘ দীপ্ত বিরাট কান্তির সমগ্রতাতেও নয়। আসলে তিনি

সুন্দর ব'লে সুন্দর নন, প্রতিভাবান ব'লেই সুন্দর। আমরা সবাই জানি যে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য সুপুরুষ, কিন্তু তাঁর রূপ রূপের চেয়ে কিছু বেশি—কিংবা তা জাগতিক অর্থে রূপই নয়, তা নন্দনতত্ত্বের রূপ। রবীন্দ্রনাথই এক জায়গায় লিখেছেন যে বেটোফেনের মাথার যে-প্রতিমূর্তিটি তাঁর ঘরে আছে সে-মুখ দেখে সৌন্দর্যের প্রচলিত আদর্শ অনুসারে কেউ সুন্দর বলবে না, কিন্তু সে-মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হ'য়ে থাকতে হয়, এদিকে ননীসুকুমার শত-শত মুখ চোখেই পড়ে না। বেটোফেন ছিলেন কুরূপ কিন্তু সুন্দর, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যও সেই জাতের। তিনি কুৎসিত হ'লেও এ সৌন্দর্যের কোনো ক্ষতি হ'তো না, কারণ বেশে বচনে ব্যবহারে, জীবনযাত্রার প্রতি ক্ষুদ্র ভঙ্গিতে, প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে তিনি শিল্পী ও স্রষ্টা, এমন পরিপূর্ণরূপে শিল্পী জগতের আরকোনো বড়ো শিল্পীই বোধ হয় ছিলেন না। অন্নদাশঙ্কর তাঁকে যে জীবনশিল্পী আখ্যা দিয়েছেন সেটা খুবই সার্থক। তাঁর মুখশ্রীতেও তাঁর প্রতিভাই প্রতিফলিত, শুধু গৌর বর্ণ ও তীক্ষ্ণ প্রত্যঙ্গের অধিকারী হ'য়ে কোনো মানুষ এত সুন্দর হয় না। সমস্ত জীবনটিই তাঁর শিল্পকর্ম; শিল্প ও জীবনকে তিনি বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখেননি, এক অপূর্ব রসায়নে দুইকে মিশিয়েছেন, শিল্প দিয়ে জীবনকে ফুটিয়েছেন, জীবন দিয়ে শিল্পকে ফলিয়েছেন। শিল্পীর পক্ষে, রূপপিপাসুর পক্ষে তাঁর আকর্ষণ তাই এত তীব্র। গোয়টে সম্বন্ধে নেপোলিয়ন বলেছিলেন, 'Here is a complete man'; রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সেই কথা। সব বই পড়া হ'লে, সব দেশ দেখা হ'লে কোনো প্রৌঢ় পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বলতে পারেন, এতদিনে দেখলুম একটা সম্পূর্ণ মানুষ।

সে-সময়ে কবির শেষ বই বেরিয়েছে 'প্রান্তিক', 'বাংলা কাব্য-পরিচয়ে'র সংকলনকার্যে তিনি তখন ব্যস্ত। দেখতুম তাঁর টেবিলের উপর আমাদের ক'জনের কবিতার বই। বিষ্ণু দে-র কবিতা সম্বন্ধে বলতেন, 'এ বুঝিয়ে দিতে পারো তো শিরোপা দেবো।' বলা বাহুল্য,

সে-রকম কোনো চেষ্টাই আমি করিনি, আর কবি এ নিয়ে আমাকে বেশি ব্যস্তও করেননি। কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায় শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবীশের দেখলুম অসামান্য উৎসাহ। একদিন সন্ধ্যাবেলা প্রতিমা দেবীর স্টুডিওতে তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয়েছিলো, মনে আছে। এমন সুন্দর ঘরটি, উপরে উঠে মনে হ'লো কোথায় এলুম! চারদিকে অন্ধকার থমথম করছে, গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে দু' একটি ইলেকট্রিকের আলো মনে হয় যেন গাছেরই কোনো আশ্চর্য ফল, আর আকাশের তারাগুলো এত কাছে যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। ঐ রকম আবহাওয়ায়, প্রথম বৈশাখের মনোরম সন্ধ্যায় কবিতা নিয়ে তর্ক না-ক'রে বরং কবিতা পড়তে ইচ্ছে করে, কিন্তু তর্কই হ'লো, যদি এমন অসমপক্ষীয় আলোচনাকে তর্ক বলা যায়। কেননা, বলাই বাহুল্য, প্রশান্তবাবুর দুর্দান্ত লজিকের সামনে আমি এগোতেই পারিনি; তিনি যত ভালো বক্তা, আমিও প্রায় তত ভালোই শ্রোতা ছিলুম, নিজের পক্ষে এটুকু মাত্র বলতে পারি।

কবির ও তাঁর পরিবারের অনুপম আতিথেয়তার আনন্দস্নানে দিন চারেক কাটিয়ে সেবার কলকাতায় ফিরলুম। এঁদের আতিথেয়তার বিশেষ একটি সৌরভ আছে যা আমাদের দেশে দুর্লভ। এমন নিখুঁত কুশলকারিতার সঙ্গে এমন নৈর্ব্যক্তিকতা বড়ো দেখা যায় না; প্রতি সূক্ষ্ম সুখ-সুবিধের প্রতি নিরন্তর নজর রয়েছে, অথচ আমাদের দেশে যাকে ভুল ক'রে বলে অন্তরঙ্গতা, সেটা নেই। আমরা বাঙালিরা যখন কাউকে সত্যিই আপ্যায়ণ করবো ভাবি তখন তাকে নিয়ে এমন একটা হুলুস্থুল বাধাই যে সে-সমাদরের চাইতে বরং অনাদর ভালো মনে হয়। আমাদের পুরোনো আমলের জামাই-আদর যেটা, তার বিস্তারিত বর্ণনা শুনলে একালের জামাইরা হয়তো শ্বশুর-দুহিতার খাতিরে অতি কষ্টে টিকে যাবেন, কিন্তু অ-জামাইরা লুব্ধ হবেন না এ-কথা জোর ক'রে বলতে পারি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়ই ঠাকুরদের বিশেষত্ব, বাংলাদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা এই পরিবারটি একই

সঙ্গে খাটি স্বদেশি ও খাশ বিলেতি। এঁদের আতিথেয়তাতেও সেটা ধরা পড়ে। অতিথিকে এরা পরিপূর্ণ শারীরিক সুখে রাখেন, আবার পরিপূর্ণভাবে নিজের মনে থাকতে দেন—ঠিক নিজের মনের মতো পরিবেষটি খুঁজে পাওয়া অতিথির পক্ষে শক্ত হয় না। ঠিক এই জিনিশটি আমার খুব ভালো লেগেছে, ভারি নতুনও মনে হয়েছে। এ যেন বাড়ি থেকে এসে আর-এক বাড়িতে ওঠা। আমরা সাধারণত অতিথিকে সাধ্যমতো সুখে রাখবার চেষ্টা করি, সাধ্যের অতীতও হয়তো করি, কিন্তু ভুলে যাই যথেষ্ট নির্জনতা, যথেষ্ট অবকাশ দিতে, যাতে সে দিনগুলিকে তার নিজের মতো ক'রে রচনা ক'রে নিতে পারে। আমরা চাই অতিথিকে 'আপন' ক'রে নিতে, মাঝখানে কোনো ব্যবধানই যেন রাখতে চাই না। সেটা ভুল। ইওরোপীয় সৌজন্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি যে-শ্রদ্ধা—যেটা আমাদের কাছে হৃদয়াবেগের অভাব ব'লে ঠেকে—উভয় পক্ষের চরম তৃপ্তি কিন্তু তাতেই। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির আতিথেয়তায় এ-জিনিশটি আছে, আবার বাঙালির স্নেহপ্রবণ-তারও যে অভাব নেই তার প্রমাণ পেলুম আসবার দিন যখন প্রতিমা দেবী বিস্কুটের টিনে ভ'রে নানারকম খাবার আমাদের সাজিয়ে দিলেন। কয়েক ঘণ্টার তো পথ, কোনো দরকার ছিলো না, কিন্তু দরকার মিটলেই মানুষের যে সব হ'য়ে যায় তা তো নয়, দরকারের উপরে যেটুকু জোটে সেইটুকুই মধুর। সত্যি বলতে, এই নিষ্প্রয়োজন আয়োজনে আমরা একটুও দুঃখিত হইনি, এবং যতদূর মনে পড়ে, খাবারগুলি যদিও আমার কন্যার নাম ক'রেই দেয়া হয়েছিলো, বর্ধমানে এসে কন্যার পিতা, মাতা ও পিতার বন্ধুরা সানন্দ কলরব করতে-করতে ওতে ভাগ বসিয়েছিলেন এবং দেখা গিয়েছিলো যে ঐ বিস্কুটের টিনে সকলের আন্দাজ সুখাদ্যই পোরা আছে। গোড়ায় বর্ণিত সকালবেলায় যে রাজকীয় ভোজবৈচিত্র্যের শুরু, তার জের চললো ফেরবার পথে বর্ধমান স্টেশন পর্যন্ত, আর ঐ পুলকিত আহারের পরে চলতি ট্রেন থেকে আকাশ-জোড়া ক্লান্ত সন্ধ্যা কেমন

বিষণ্ণ সুন্দর লেগেছিলো তাও মনে আছে।

এবার যাবার কথা উঠতে এ-সব সুখ-স্মৃতি মনে ভিড় ক'রে এলো। গরমের জন্য ভাবনা নেই—বীরভূমের তীব্র শুকনো গরম সেবারেও ভোগ করেছি। তাছাড়া যেখানে দেশভ্রমণ কি হাওয়াবদল উদ্দেশ্য নয়, একজন ব্যক্তিকে দেখা ও শোনাই আসল কথা সেখানে আবহাওয়ার কথাটা অনেকটা তুচ্ছ হ'য়ে পড়ে। আছি কলকাতায়, সেখানেও এমন-কিছু সুশীতল নয়। কবিকে ও তাঁর সেক্রেটারিকে আমাদের অভিপ্রায় জানিয়ে চিঠি লিখলুম। সুধাকান্তবাবু জানালেন আমরা গিয়ে কবির 'শ্যামলী'তেই থাকতে পারবো। অতএব এই গ্রীষ্মাবকাশে কেউ যখন পাহাড়ে কেউ সমুদ্রতীরে, আমরা রওনা হলুম নিরানব্বুই মাইল দূরে—

জগৎ এসে যেথায় মেশে।

রতন কুঠি ও অন্যান্য বাড়ি-ঘর

'আমরা' কথাটি এখানে নেহাৎ গৌরবাত্মক নয়, ছোটোখাটো একটি দলই চলেছি। আমি আছি, মক্ষিরানি আছেন, আছেন মানবিকা, তাঁকে এখন আর মানবিকা বললে মানায় কিনা সন্দেহ, আরো একজন ছোটো মানুষ আছেন, তিনি এতই ছোটো যে তাঁকে কণিকা বলা যায়। এই শেষোক্ত মানুষটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন পরিচারিকাও আছেন, তাঁর রক্ষণশীলতা নিদারুণ, পাছে আমাদের ছাতা জুটো কোনো সহযাত্রী অপহরণ করে সে-ভয়ে সারা রাস্তা তিনি নিজেও শান্তি পেলেন না, আমাদের সকলকেও ব্যস্ত ক'রে রাখলেন। শান্তিনিকেতন থেকে যেদিন আমাদের চ'লে আসবার কথা তার আগের দিনই তিনি সমস্ত জিনিশপত্র বাক্সবন্দী করলেন—পাছে কিছু ফেলে যাই—তারপর কোথায় সাবান কোথায় তোয়ালে চারদিক হাৎড়ে বেড়াই। এ নিয়ে আমি কিছু উষ্মা প্রকাশ করেছিলুম, এবং তারই ফলে বাড়ি ফিরে এসে দাড়ি কামাবার সাবানটি আর খুঁজে পাইনে, শোনা গেলো আমাদের এই পরিচারিকা সেটি টেবিলের উপর প'ড়ে থাকতে দেখেছিলেন, কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই আনেননি, যেহেতু আমি তাঁকে অতি-সতর্কতার অপবাদ দিয়েছিলুম। এ ছাড়া আমাদের সঙ্গে চলেছেন আমাদের সাহিত্যিক ও তার্কিক বন্ধু জ্যোতির্ময় রায়। ইনি কথোপকথনে সিদ্ধপুরুষ, সুতরাং রেলগাড়ির কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা মিনিটও নীরব কি নিরুৎসাহ কাটলো না। আমরা যাচ্ছিলুম সকালের গাড়িতে ; শেষের দিকে বেশ গরম বোধ হচ্ছিলো, আর বর্ধমান ছেড়ে এগোতে-এগোতে ক্রমশই নন্দলালবাবুর ছবির মতো দৃশ্য চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছিলো, এ ছাড়া পথের বর্ণনায় আর-কিছু বলবার নেই।

ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে দুপুরবেলায় নামলুম বোলপুরে। মাল নামাবার সময় মক্ষিরানির ছোট্ট তেলের শিশি হোল্ড-অল থেকে স্খলিত হ'য়ে পড়লো রেল-লাইনের ফাঁকে। উঁকি মেরে দেখা গেলো শিশিটি ভাঙেনি, অতএব সেটি পুনরুদ্ধারের আশায় ছায়া ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি যতক্ষণ গাড়ি না ছাড়ে। এমন সময় শোলা টুপি পরা এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাকে নাম জিজ্ঞেস করলেন। বোঝা গেল ইনি গেস্ট হাউসের ম্যানেজার, এসেছেন স্টেশন থেকে আমাদের সংগ্রহ করতে। গাড়ি ছেড়ে গেলো, তেলের শিশি কুড়োনো হ'লো, তারপর স্টেশনের বাইরে এসে দেখি একখানাও ট্যাক্সি নেই। অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেকটিই বিকল। একখানারই জঙ্গমতা আছে, সেটি গেছে যাত্রী নিয়ে শান্তিনিকেতনে, 'এক্ষুনি' ফিরবে। এক্ষুনি বলতে মিনিট কুড়ি হ'লো। ছায়ায় দাঁড়িয়ে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে বিশ্রাম্ভালাপে এ-সময়টা কাটলো। লক্ষ্য করলুম যে-রকম গরম আশঙ্কা ক'রে এসেছিলুম, সে অনুপাতে তাপের তীব্রতা মোটেও অনুভূত হচ্ছে না, বরং এই চড়া দুপুরবেলার হিশেবে কলকাতার তুলনায় একটু ঠাণ্ডাই বোধ হচ্ছে। আগের দিনই নাকি এখানে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, তাই প্রকৃতির এই করুণা। আমাদের কপাল ভালো।

ঝরঝরে একটি গাড়ি এসে দাঁড়ালো, আমরা উঠে বসলুম। জ্যোতির্ময়বাবু একবার এক গাড়ির কথা বলেছিলেন যার হর্ন ছাড়া সর্বাঙ্গই আওয়াজ করে। এ-গাড়িটি ঠিক সে-রকম নয়, কারণ এর হর্নেও বেশ জোর আওয়াজ। গাড়ি আমাদের নিয়ে তুললো রতন কুঠিতে, যার প্রাক্তন নাম টাটা বিল্ডিং। বারান্দায় সুধাকান্তবাবু প্রচুর ও সহাস্য অভ্যর্থনা নিয়ে ব'সে। 'শ্যামলী' নিখুঁত অবস্থায় নেই, তাই এই আধুনিক অতিথিভবনে আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। ব্যবস্থা মনোরম; মাঝের মস্ত হলঘরটিতে আমরা, আর পাশের একটি ছোট ঘরে জ্যোতির্ময়বাবু। ঘরগুলিতে আসবাবপত্র প্রচুর ও অভিনব, কিন্তু ঘরের মনে ঘর প'ড়ে থাকতো. বারান্দাতেই কাটতো আমাদের সময়। রতন কুঠি

বাড়িটি মস্ত, আকার অর্ধ-চন্দ্রের মতো, মস্ত চওড়া বারান্দা আগাগোড়া ঘুরে গেছে। সামনে অবারিত দক্ষিণ, অন্যান্য দিকেও বাধা নেই, উত্তর আর পুবে তাকালে চোখে পড়ে ঈষৎ-বন্ধুর গেরুয়া প্রান্তর, ফাটা-ফাটা খোয়াইয়ের শীর্ণ শুষ্ক রেখা, দূরে-দূরে ফাঁকে-ফাঁকে তালবন আর উত্তরের দিগন্তে গাছপালার ঘনতা, মনে হয় কাছেই পাহাড় আছে। এই নির্জন বৃক্ষবিরল দেশে গ্রীষ্মের নির্মম রোদে শূন্য মাটি যেন হাহাকার ক'রে ওঠে—'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল' কথাটির মানে এখানে এলে বোঝা যায়। উত্তর-পশ্চিম কোণে চোখের আদিগন্ত দৌড় হঠাৎ বাধা পায় আওয়াগড়ের রাজার বাড়িটিতে, ও-বাড়িকে হাওয়াগড় বললে দোষ হয় না, ধূ-ধূ প্রান্তরের মধ্যিখানে ও হঠাৎ যেন হাওয়াতেই গড়া। দক্ষিণে দেখা যায় গেস্ট হাউস প্রাঙ্গণের প্রাচীন গাছগুলির স্নিগ্ধ সবুজ, সেখানে সকালে সন্ধ্যায় কত বিচিত্র পাখির ডাকাডাকি; আর পশ্চিমে ঘন-পল্লবিত উত্তরায়ণ, 'উদয়ন' বাড়িটির অদ্ভুত স্থাপত্য, তার পিছনেই আবার আকাশের সীমাহীনতা। চারদিকের পিঙ্গল পাংশুতার মধ্যে শান্তিনিকেতন একটি শ্যামল দ্বীপের মতো।

আমরা আছি রতন কুঠিতে, চারদিকে রবীন্দ্রনাথের কত গানের কত কবিতার দৃশ্যপট ছড়ানো। এ-বাড়ি এমন কায়দায় তৈরী যে পুব দিকের অর্ধেকে প্রত্যেকটি ঘর দক্ষিণ আর পুবে সমান খোলা, আধেক চাঁদের মতো বারান্দাটিও এমন যে প্রত্যেক ঘরের সামনেকার অংশটুকু অন্য সব অংশের চোখের আড়ালে—অন্তত খাটটা ইচ্ছে করলেই প্রতিবেশীর চোখের আড়ালে টেনে নেয়া যায়, বাইরে শুয়েও শয্যার নির্জনতা বজায় রাখা সম্ভব। যে-কোনো গরম দেশেই এ-ধরনের বারান্দা উপভোগ্য, বিশেষত যেখানে রাত্তিরে বাইরে শোয়া ছাড়া উপায় নেই সেখানে এর সার্থকতা খুবই বেশি।

আশ্চর্য এই যে 'উদয়ন', পুরোনো গেস্ট-হাউস আর এই রতন কুঠি ছাড়া শান্তিনিকেতনের প্রায় কোন বসত-বাড়িই গরম দেশের উপযোগী ক'রে গড়া নয়। এ-তিনটি বাড়িরই যথেষ্ট উঁচু ছাদ, ঘরগুলিও বড়ো-

বড়ো। অন্য বাড়িগুলোতে সৌন্দর্যের দাবি মেটাতে গিয়ে আরাম মারা পড়েছে। ছোটো-ছোটো নিচু বাড়িগুলো দেখতে অপূর্ব সুন্দর, চারদিকের অফুরান প্রান্তরের সঙ্গে তাদের ছন্দের সঙ্গতি, হঠাৎ যেন ওরা ঢিবির মতো এখানে-ওখানে উঠেছে, দিগন্তরেখাকে কোথাও খণ্ডিত করেনি। এ-ধরণের স্থাপত্য সম্বন্ধে কিছুই বলবার থাকতো না, যদি বাড়িগুলো আভরণমাত্র হ'তো, যদি গৃহীরা সব সময়ই বাইরের খোলা হাওয়ায় কাটাতে পারতেন। শান্তিনিকেতনে বাইরের খোলা-হাওয়ার জীবন যতদূর সম্ভব বেশি, তা ঠিক, ইস্কুল-কলেজের লেখাপড়াও গাছের ছায়ায়; তবু বিশেষ কাজের কিংবা বিশেষ ঋতুর তাগিদে ঘরের ভিতরে থাকবারও দরকার হ'তে পারে। কিন্তু ভিতরে ঢুকলে মনে হয় এ বুঝি পাহাড়ি দেশের বাড়ি, তেমনি নিচু ছাদ, তেমনি ছোটো-ছোটো ঘর। শীতকালে এ-বাড়িগুলোর অভ্যন্তর সুখকর হ'য়ে ওঠে সন্দেহ নেই, কিন্তু গরম কালে? আর আমাদের দেশে শীত তো ক্ষণিকের অতিথি, গ্রীষ্মই মেয়াদি।

একদিন বিকেলে গিয়েছিলুম কৃষ্ণ কৃপালানির বাড়িতে। তাঁর 'মালঞ্চে'র মতো নয়নবিমোহন বাড়ি আমি কমই দেখেছি।

> 'ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার
> চারিদিকে নিকুঞ্জ-ঘেরা,
> সেথায় ভ্রমরেতে গুনগুন করে,
> কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া।'

এ-কবিতাটি মনের চোখে যে-ছবি ফোটায়, সে-ছবি যেন বাস্তবে দেখলুম। কবির থাকবার মতো বাড়ি বটে, যদিও শ্রীযুক্ত কৃপালানি কি নন্দিতা দেবী কেউই কবি নন। মস্ত বড়ো তকতকে পরিষ্কার বাগান, তার মধ্যে লাল কাঁকরের পথ, পায়রা আছে, খরগোশ আছে, পশ্চিমে উন্মুক্ত প্রান্তর দিগন্তে মেশা। শুধু যদি কাছাকাছি একটি নদী থাকতো! কোথায় ময়ূরাক্ষী!

বাগানে ব'সে চায়ের সঙ্গে গল্প, তারপর নন্দিতা দেবীর মুখে তাঁর

দাদামশাইর গান, তারপর সূর্যাস্তের আকাশ রঙিন মেঘে-মেঘে গ'লে যেতে লাগলো, পুবের আকাশে বিয়ের রাতের রং ধরলো। যখন অন্ধকার নামলো আর আমরা উঠি-উঠি করছি, কৃপালানি ডাকলেন ঘরের ভিতরে কয়েকটা দেয়াল-ছবি দেখতে। আলো ছিলো না, টর্চ জ্বেলে ছবি দেখলুম অতি কষ্টে, আর সেই দু'তিন মিনিটে টের পেলুম গরম কাকে বলে। ঘরের মধ্যে যেন বহু যুগের বহু বিরহী যক্ষের দীর্ঘশ্বাস সঞ্চিত হ'য়ে আছে। অত নিচু ছাদ যে বসবাসের দিক থেকে ঠিক সুবিধের নয়, এ-কথা ওখানেও অনেকে মানেন দেখলুম।

শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যরীতির 'মালঞ্চ' একটা উদাহরণ মাত্র। কবি নিজে সম্প্রতি যে-সব বাড়িতে থেকেছেন, শিল্পকর্ম হিসেবে তার প্রতিটি অনিন্দ্য, কিন্তু গ্রীষ্মাবাস হিসেবে কেউ লোভনীয় বলবে না। বাইরে থেকে দেখতে চোখ জুড়োয়, ভিতরে ঢুকলেই উত্তাপের আলিঙ্গন। গ্রীষ্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সহিষ্ণুতা, 'শ্যামলী'র যে-ছোটো ঘরটিতে বৈশাখের দুপুরবেলায় তাঁকে কাজ করতে দেখেছি, অন্য যে-কোনো ব্যক্তি তার উত্তাপে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হতেন—এ-কথা জোর ক'রে বলতে পারি। এবারে এক ফাঁকে 'শ্যামলী' পর্যবেক্ষণ ক'রে এলুম, ভিতরে কিছু বদলানো হয়েছে মনে হ'লো, এক পাশে হয়েছে চাকরদের রান্নাঘর, সেই আম গাছের ছায়াটি ঝরা পাতা নিয়ে অবহেলায় প'ড়ে আছে। প্রয়োজন-মতো বাড়ির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাড়ানো বদলানো কবির এক দুর্বার খেয়াল', তারপর এই প্রক্রিয়া চলতে-চলতে বাড়িটি হয়তো এমন বে-সামাল হ'য়ে ওঠে যে বাড়ি বদলের দরকার হয়। তখন নতুন ছন্দে নতুন গৃহ গ'ড়ে ওঠে। 'কোনার্ক' যখন কবির অধিকারে ছিলো তখনকার সঙ্গে এখনকার আভ্যন্তরীণ মিল কিছুই আছে ব'লে মনে হ'লো না, শুধু বাইরের চেহারাটা এক আছে। এখন বাড়িটি অনিলবাবুর, মাঝে-মাঝে গিয়ে বসতুম বাইরের বারান্দায় মালতীলতা-জড়ানো ডালপালা-ছড়ানো ঐতিহাসিক শিমুল গাছটির ছায়ায়—আমরা যারা কোনোদিন স্বর্গে যাইনি, এবং যাবোও না, তাদের মনে স্বর্গের যে-রকম একটা কল্পনা

আছে, ঐ নিরিবিলি ছায়া-ঢাকা জায়গাটুকু অনেকটা সেইরকম মনে হ'তো। কিন্তু ঘরের ভিতরে আগুন হ'য়ে আছে। ঘরে আর বাইরে আশ্চর্য তাপতারতম্য।

এদিক থেকে আমার খুব ভালো লাগলো 'উদীচী'। এটি কবির সব-শেষের বাড়ি, এবং আমি বলবো সবচেয়ে ভালো। সৌন্দর্য আর উপভোগ্যতা এখানে মিলেছে। কবির একলা থাকার জন্যে যে-ক'টি বাড়ি তৈরি হয়েছে তার মধ্যে এটিই শুধু দোতলা। দোতলা হ'লেও উঁচু নয়, একতলা মাটির সঙ্গে সমান, পুবদিকে দোতলার গা বেয়ে একটা গাছ উঠেছে, হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমস্ত শান্তিনিকেতনের একটা নতুন চেহারা চোখে পড়ে, মনে হয় এই প্রথম দেখছি। 'শ্যামলী' দেখে মনে হ'লো তার প্রাণ তাকে ছেড়ে চ'লে গেছে, কিন্তু 'উদীচী' কবির সদ্যপরিত্যক্ত ব'লেই বোধ হয় এর দোতলায় এখনো একটা সজীব উজ্জ্বল ভাব আছে। এই দোতলাটি যেমন সুন্দর তেমনি সুখকর।

স্থাপত্যের দিক থেকে শুধু নয়, সুখকরতার দিক থেকেও শান্তিনিকেতনের শ্রেষ্ঠ বাড়ি যে 'উদয়ন' সে-কথা না বললেও চলে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রাসাদটি তাঁরই নেতৃত্বে একদিন ঘুরে দেখলুম। দেখবার মতো বটে। নানা কোণ, মোড় ও উঁচু-নিচুর ভিতর দিয়ে ছন্দের অক্ষুণ্ণ সুষমা বাইরে যেমন প্রকাশিত, ভিতরেও তেমনি অনুভূতিগম্য। তাছাড়া যে-সব ছবি ও অন্যান্য শিল্পকর্মে বাড়িটি সাজানো তারও অন্ত নেই। একতলায় বসবার ঘরে আর বড়োখাবার ঘরটিতে শুধু রবীন্দ্রনাথেরই আঁকা ছবি; বাড়ির অন্যান্য অংশে অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র, নন্দলাল, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী এবং আরো অনেকের ছবি দেখতে পেলুম। দর্শনেন্দ্রিয়ের সম্ভোগ চারদিকেই; সময় অল্প, দ্রষ্টব্য অত্যধিক, অতএব চোখ বুলিয়ে যাওয়া হ'লো, ঠিক দেখা হ'লো না। বাংলার প্রধান শিল্পী যে-ক'জন, তাঁদের প্রায় সকলেরই হাতের কিছু-কিছু নিদর্শন আছে, শুধু যামিনী রায়েরই কোনো ছবি নেই। এ-কথাটা প্রতিমা দেবী একদিন

কথাচ্ছলে উল্লেখ করেছিলেন ; তাতে বোঝা গেলো এ-অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন, এবং হয়তো একে পূর্ণ ক'রেও তুলবেন।

'উদয়নে' আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো, 'পুপেদিদি'র ঘরগুলি। স্বামিনীর অনুপস্থিতে ঘরগুলি ঠিক তাঁর মনের মতো ক'রেই সাজানো আছে। শোবার ঘরটি উত্তর, দক্ষিণ আর পশ্চিমে খোলা—এই পশ্চিম দিকই মনোহর। ধূ-ধূ প্রান্তর আকাশে গিয়ে মিশেছে ; উত্তর পশ্চিম কোণে যেখানে মেঘ ওঠে, যেদিক থেকে বৃষ্টি আসে, সেদিকে দৃষ্টি আদিগন্ত অবারিত। এ ঘরটির নাম হওয়া উচিত শাওনি, বর্ষা দেখবার পক্ষে এমন ঘর হয় না। মস্ত-মস্ত কাচ-বসানো জানলা দিয়ে চোখ ডুববে বর্ষার সমারোহে, মন ডুববে। রথীবাবু বলছিলেন আকাশের ঐ কোণে উঠে দৈত্যের মতো মেঘ যখন ছুটে আসে সে নাকি এক আশ্চর্য দৃশ্য।

রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী উভয়েই নানা শিল্পে নিপুণ। উদ্ভিদ-জাতির সঙ্গে রথীবাবুর একাধারে বন্ধুতা ও প্রভুত্বের সম্পর্ক, প্রমাণ তাঁর বাগান। ঐ রুক্ষ অনুর্বর দেশে বাগান করাই তো দুঃসাধ্য, তার উপর তিনি শুধু বাগান করেননি, দিশি ও বিদেশি নানা গাছপালাকে কঠোর শাসনে বেঁধে নিজের ইচ্ছা-মতো রচনা করেছেন ; যে-গাছ স্বভাবত দীর্ঘ তাকে অতি খর্ব ক'রে রেখেছেন, যে-গাছ স্বভাবত ঋজু তাকে লতার মতো ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ এই অ-স্বাভাবিক অবস্থায় গাছগুলো দুঃখে নেই ; তারা স্বাস্থ্য ও প্রাণে পূর্ণ, যথাসময়ে ফুল ফোটাচ্ছে, ফল ধরাচ্ছে। এ একরকমের ময়দানবিক বিদ্যা, আরো আশ্চর্য এই কারণে যে এর মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই, এর প্রয়োগক্ষেত্র বাস্তব ও জীবন্ত। বাগানে দুটো ময়ূর ঘুরে বেড়ায়, আর এক প্রান্তে একটি কৃত্রিম জলাশয়ের এক ধারে দুটো সারস পাখি ধ্যানমগ্ন মুনির মতো চেহারা ক'রে ব'সে থাকে, অন্য ধারে দেখলুম একটি ইংরেজ মেয়ে খোলা পায়ে একটি হাঁ-করা মকর-মূর্তি গড়ছেন। আমরা কাছে যেতেই বললেন যে যখনই কাজ করতে আরম্ভ করেন, চারদিক থেকে অসংখ্য

পিঁপড়ের আক্রমণে অস্থির হয়ে ওঠেন। পিঁপড়ের কামড়টা অবশ্য লোভনীয় নয়, কিন্তু এই রমণীয় নির্জনতার মধ্যে একলা চুপচাপ মাটির মূর্তি গড়া—এর চেয়ে সুখের কাজ আর কী হ'তে পারে! কাছে দাঁড়িয়ে দেখতেও ভালো লাগলো। তখন সূর্যাস্তের সময়, একটি লাল আভার গ্রন্থিতে বাঁধা পড়েছে আকাশের সঙ্গে পৃথিবী; জল, মাটি, গাছ সব যেন হেসে উঠেছে।

বাগানের এই প্রান্তেই প্রতিমা দেবীর স্টুডিও। তার একতলার কোনো ব্যবহার ছিলো না; রথীন্দ্রনাথ সম্প্রতি সেটিকে তাঁর নিজের একটি কর্ম-কক্ষে পরিণত করেছেন। ঘরটি এত ক্ষুদ্র আর এত নিচু যে ঠিক মনে হয় যেন গুহা। বাইরের দেয়াল লতা-জড়ানো, পাথর-বসানো. তাতে গুহার সঙ্গে সাদৃশ্য আরো স্পষ্ট ফুটেছে। দোতলার একতলা ব'লে এটি গরম কম, আর শান্তিনিকেতনের পক্ষেও অতি নিভৃত, অতি মনোরম পরিবেষের মধ্যে বসানো। ঘরের মধ্যে অত্যন্ত নিচু ও ছোটো একটি টেবিল, গোটা দুই চেয়ার আর শান্তিনিকেতনের পক্ষে খুবই উঁচু একটি তাকিয়াকীর্ণ খাট। ঘরটির যেন বিশেষ একটি চরিত্র দেখতে পেলুম, সজ্জার উপকরণ বা পদ্ধতি ছাড়িয়ে তা যেন অন্য কিছু।

শান্তিনিকেতনে বাড়ি নিচু, জানলা নিচু, আশবাবপত্র, তাও নিচু। এখানকার জানালার প্রশংসা শতমুখে করতে হয়। এমন উদার উন্মুক্ত বাতায়ন আমাদের দেশে চোখেই পড়ে না। চোরের ভয় নেই ব'লে সিকও নেই, হাওয়ার আসা-যাওয়ার রাজপথ খোলা প'ড়ে আছে, আর চারিদিকের আকাশ-মাঠের প্রদর্শনীর মধ্যে দৃষ্টিকে রওনা ক'রে দিলেই হ'লো। 'মালঞ্চে'র পশ্চিমের ঘরের জানালায় একদিন সকালে খানিকক্ষণ ব'সে ছিলাম। দিনটা অল্প মেঘলা ছিলো; নির্জন প্রান্তর পার হ'য়ে চোখ যেন একেবারে অসীমে গিয়ে ঠেকে, মনে হয় এ-ই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত, এর পরে আর-কিছু নেই। রমনার নীলখেতের কথা মনে পড়ে, কিন্তু এমন অফুরন্ত শূন্যতা পূর্ববঙ্গে

কোথায় ! আর-কিছু না হোক্, নিবিড় গাছপালায় চোখ ঠেকবেই

রতন কুঠিতে আমাদের ঘরে পুবদিকে একটা মস্ত জানালা ছিলো। জানলাটা আমরা এসে বন্ধ দেখেছি, বন্ধই রেখেছি। ঘরের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নেই, তাই খোলবার কথা মনেও হয়নি। কিন্তু একদিন দুপুরে ঘরের মধ্যে টেবিলে ব'সে কিছু লেখাপড়ার কাজ করছিলাম, দক্ষিণের দরজা দিয়ে খুব হাওয়া আসছিলো, তবু বেশ গরম। এমন সময় মঙ্কিরানি এসে পুবের ঐ জানলাটা দিলেন খুলে। সঙ্গে-সঙ্গে দুরন্ত পুবালি হাওয়ায় টেবিলের কাগজপত্র গেলো উড়ে, আর অবাক হ'য়ে আবিষ্কার করলুম ঐ জানলা দিয়ে পুব-দিগন্তের এক নতুন দৃষ্টিহরণ দৃশ্য। হায় হায়, এতদিন কাটালুম এখানে, জানলাটা আগে কেন খুলিনি, এ-দৃশ্য দিনের পর দিন চোখের সামনে প'ড়ে ছিলো, অযত্নে রুদ্ধ ক'রে রেখেছি। এদিকে কালই আমাদের চ'লে যাবার কথা। কিন্তু সুখের কথা এই যে ঐ তারিখে আমাদের যাওয়া হ'লো না, আরো কয়েকদিন থেকে গেলুম, এব ঐ জানলাটিকেও কিছু উপভোগ করা গেলো।

জানলাটি আবিষ্কৃত হবার পর থেকে মানবিকার এক খেলা হ'লো সেটি খোলা এবং বন্ধ করা। তাঁর আনন্দের কারণ এই যে জানলাটি এত নিচু যে তিনি নিজের পায়ে নির্ভর ক'রেই তাতে উঠতে পারেন। আমি যদি মুহূর্তে-মুহূর্তে তাঁকে জানলাটি খুলতে ও বন্ধ করতে বলতুম তাহ'লে এই নতুন ক্ষমতার যথেষ্ট ব্যবহার করতে পেরে তিনি তৃপ্ত হতেন, কিন্তু বয়স্ক মানুষের নির্বোধ স্থিরমতিত্বে তাঁর আনন্দের উচ্ছ্বাস অনেকখানি ব্যাহত হয়েছিলো। এদিকে আশবাবপত্রও এত নিচু যে শ্রীমতী কণিকাও তাদের নিয়ে কিছু স্বাধীন ব্যবহার করতে পারতেন, এবং আমরা তাঁর দেহের ও অন্যান্য ভঙ্গুর সামগ্রীর নিরাপত্তার কথা ভেবে সর্বদাই শঙ্কিত থাকতুম। এই আশবাবগুলির বিশেষত্ব প্রথম দর্শনেই চোখে ঠেকে। এখানে তুচ্ছতম কোনো প্রয়োজনের জিনিশ দেখলুম না যা সুন্দর নয়। শুধু সুন্দর নয়, অভিনব; শুধু অভিনব নয়, বিশেষভাবে চরিত্রবান। একটি দৃঢ়

স্বকীয়তা সমস্ত জিনিশে পরিস্ফুট। চেয়ার টেবিল খাট পরদা সব জিনিশেই একটি বাহুল্যবর্জিত পরিচ্ছন্নতা. ধনাঢ্য বিলাসিতার ভাব একেবারেই অনুপস্থিত, পূর্ব-পশ্চিমের মিলন ঘটেছে এখানেও। জিনিশগুলোর কাঠামো বিলিতি, কিন্তু রচনা ভারতীয় ছন্দে ; খাবার টেবিলের আসনে হেলান দেবার পিঠ নেই, ফলে মাঝেমাঝে হেলান দিতে গিয়ে আমরা জব্দ হয়েছি, কিন্তু ওর উদ্দেশ্য হয়তো আসনপিঁড়ি হ'য়ে খেতে বসবার ভারতীয় রীতিকে প্রশ্রয় দেয়া। আর সকালে-বিকেলে চায়ের আসরে ঐ আসনগুলো টেবিলের মতো ক'রেও ব্যবহার করা যেতো ; আবার আয়নার টেবিলের দেরাজগুলো একটি ছোটোখাটো সংসারের ভাঁড়ার ঘর হ'তে পারে। বিভিন্ন ব্যবহারের এই সমন্বয়ে পরিসর ও উপকরণের একটি সুচারু মিতব্যয়িতা ধরা পড়ে, কোনো ঘরই জিনিশে বোঝাই মনে হয় না, অথচ সবই আছে। দেয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত কংক্রীটের বেদী কবির আবাসে প্রায়ই দেখেছি, তাতে বই খাতা রাখা চলে, আবার কেউ এলে বসতেও বাধা নেই। দেয়ালের মধ্যে চোরা দেরাজও লক্ষ্য করলুম এখানে ; জানলায় ব'সে দৃশ্য ছাখো, আর তার তলায় দেয়ালের গহ্বরে বন্ধ ক'রে রাখো যা খুশি। কলকাতার ফ্ল্যাটে এ-ধরনের আশবাব প্রচলিত হ'লে আমাদের ভাগ্যে যে-স্বল্প পরিসর জোটে তার চরম ব্যবহার সম্ভব হয়।

এ-সব আশবাবে বড়োলোকি ভাবটা যে নেই সেটাই সব চেয়ে ভালো লাগে। চোখ-ধাঁধাঁনো চমৎকারিত্বের দিক থেকে বিলেতি দামি আশবাবের কাছে এরা হার মানবে তাতে সন্দেহ কী। তবে কলকাতার ধনী যখন আর্মি-নেভির আশবাব দিয়ে বাড়ি সাজান তখন আমাদের ঈর্ষা হয়তো লাগে কিন্তু শ্রদ্ধা জাগে না, কারণ আমরা জানি যে নিছক টাকার জোরেই তিনি এ-সব মহামূল্য সামগ্রীর অধিকারী হয়েছেন, কাল আমার হাতে টাকা এলে নতুনতর কায়দার গৃহসজ্জা আমার হ'তে পারবে। ওরা যে দামি তাতেই ওদের প্রধান গৌরব। কিন্তু শান্তিনিকেতনের জিনিশগুলো টাকার মাপে যাচাই করবার কথাই ওঠে না, এদের পিছনে যে

সৃজনী বুদ্ধি আর শিল্পবোধ আছে সেটাই আসল। অর্থের দিক থেকে মূল্যবান হোক কি না-ই হোক, এদের সৌন্দর্যগত ও ব্যবহারগত মূল্য সমানই থাকে; যেখানেই যাই সেখানেই অনাড়ম্বর সুরুচির সুষমা মনে শ্রদ্ধা জাগায়। জাঁকালো নয়, মামুলি নয়, সবই সুন্দর। 'উদীচী'তে কবির শোবার ঘরে দেখলুম, গোটা চারেক প্যাকিং বাক্স জোড়া দিয়ে এক চমৎকার খাট তৈরি হয়েছে; মহার্ঘ রাজশয্যার পাশেও এ অনায়াসে স্থান পায় এব নির্মাণনৈপুণ্যের জোরে। যা প্রচলিত মতে পরিত্যাজ্য তার ব্যবহারেই সৃজনীপ্রতিভার পরিচয়, যেমন রন্ধনশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পোলাও কোর্মা নয়, তরকারির খোশার চচ্চড়ি। স্বভাবতই সুস্বাদু একটা জীবকে প্রচুর মশলাসহযোগে যে-কোনোরকমে ভোগ্য ক'রে তোলা যায়, কিন্তু ঐ খোশাটাকে সুখাদ্য ক'রে তোলা যার-তার কাজ নয়। ভালো-ভালো উপাদান থেকে নির্দিষ্ট প্রথা-মতো দুর্মূল্য আশবাব তৈরি করা, আর হাতের কাছে যা-কিছু পেলুম তাকেই নিজের ব্যক্তিগত সুবিধে ও রুচি অনুযায়ী গ'ড়ে তোলা—এ দুয়ে কি তুলনা হয়! শান্তিনিকেতনের আশবাব নির্দিষ্ট কোনো প্রথাকে মানে না—ঠিক সুবিধের উপর নজর রেখে বাড়ানো-কমানো গড়া-পেটা চলে। হয়তো খাটের মধ্যে একটা ফাঁক রইলো, তাতে শুয়ে-শুয়ে পড়বার বইপত্র রাখা চলবে, কিংবা খাটের শিয়রের দিকে দুটো তাক করা গেলো, তাতে থাকতে পারে জলের গেলাশ, সিগারেটের কৌটো, বই খাতা কলম—যার যেমন প্রয়োজন। এরা কোনো চপল ফ্যাশনের দাসত্ব করে না ব'লেই এদের চট ক'রে পুরোনো হ'য়ে যাবার আশঙ্কা নেই, এদের গায়ে ব্যক্তিত্বের যে-ছাপ আছে সেটা টেঁকসই।

ছুটি ! ছুটি !

দু' তিনদিন থাকবো মনে ক'রে বেরিয়েছিলাম; কিন্তু পরিপূর্ণ পদ্মের মতো এক-একটি দিন যখন ফুটে উঠতে লাগলো, এক-এক ক'রে তেরো দিন থেকে গেলুম। দিনগুলির সংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু সব দিক থেকে এমন নিখুঁত, এমন পরিপূর্ণ অবকাশ যাপন আমরা কল্পনাতেই ভাবি, বাস্তবে বড়ো প্রত্যক্ষ করি না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রত্যহ কিছু সময় কাটানো, তাঁর কাছে ব'সে তাঁর অপরূপ কথা শোনা—এ তো একাই অন্য বহু লোভনীয়কে বহু দূরে অতিক্রম ক'রে যায়; তার উপর অন্যান্য বিষয়েও সুখ, শান্তি কি আনন্দের অভাব ছিলো না। দিনগুলি কেটেছে রাজকীয় হালে, মন্দাক্রান্তা চালে, প্রতি মুহূর্তেই ছিলো পূর্ণতা। প্রথমত, সংসার করার ঝকমারি একেবারেই অনুপস্থিত; কোনো এক অদৃশ্য নিপুণ হাতে সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত, কী চাই বললেই হ'লো, তক্ষুনি প্রস্তুত। বারোমাস যারা সংসার চালাবার দুর্ভোগ সয়, অনেক সময় বিদেশে গিয়েও তা থেকে মুক্তি পায় না, তাদের পক্ষে শুদ্ধু এই দায়িত্বহীনতা যে কতখানি আনন্দের তা বুঝতে হ'লে আমাদেরই মতো একান্ত আত্ম-নির্ভর হ'য়ে প্রয়োজনের চেয়ে কম টাকায় সংসার চালাবার কিছু অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। স্বয়ং কবির সস্নেহ দৃষ্টি ছিলো আমাদের 'পরে; তাঁর পরিজনদের সক্রিয় প্রীতি আমাদের সর্বদা ঘিরে রেখেছে। আর আমাদের সুখ-সম্পাদন অতি প্রত্যক্ষভাবে যাদের হাতে ছিলো, অর্থাৎ রতন কুঠির পরিচারকরা, তারাও কর্মতৎপর ও অত্যন্ত ভদ্র। রান্না যে করতো তার নাম পঞ্চা, তার পারিবারিক ইতিহাস শান্তি-নিকেতন আশ্রম স্থাপনের সঙ্গে জড়িত। বীরভূমের এই অঞ্চলটা লর্ড

সিংহদের জমিদারির অন্তর্গত। দেবেন্দ্রনাথ একদিন যাচ্ছিলেন সিঙ্গিদের বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। এখন যেখানে শান্তিনিকেতন সেখানে এসে জায়গাটি তাঁর হঠাৎ বড় ভালো লেগে গেলো। বেহারাদের পাল্কি নামাতে বললেন। তারপর বিখ্যাত ছাতিম তলায় ব'সে একলা কাটালেন সাত দিন সাত রাত্রি। এই জনশূন্য ভয়সঙ্কুল অস্থানে যে-ব্যক্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখলে সে স্থানীয় ডাকাত-দলের সর্দার। সে নিজের গরজেই মহর্ষির দেখাশোনা করতো, গ্রাম থেকে দিতো খাবার এনে, এবং দস্যু-প্রধানের তত্ত্বাবধানে কোনো অনিষ্ট তার হ'তে পারেনি। পরে মহর্ষি যখন এখানে এসে কুটির বাঁধলেন ঐ সর্দারকেই তাঁর প্রহরী ক'রে নিলেন, তার রক্তাক্ত পেশা গেলো বন্ধ হ'য়ে। পঞ্চা সেই সর্দারের নাতি। এই রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনবার পরদিন রতন কুঠির দ্বিতীয় ভৃত্য কাশীকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হে, তোমার ঠাকুরদাও কি ডাকাত ছিলেন?' সে অমায়িকভাবে একটু হেসে বললে, 'আজ্ঞে হাঁ। এই যে লাল মাটির রাস্তা দেখছেন শিউড়ির দিকে গেছে, এ-পথ দিয়ে যত লোক যেতো তাদের মেরে ফেলাই ছিলো ওঁদের চেষ্টা।'

ঘরকন্নার বালাই নেই ব'লে বিশ্রাম আমাদের প্রচুর। কোনো কাজ নেই। এ-কথাটি বলতে পারা যে কত মধুর, তা ঠিক এই সময়ে আমি অতি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম, কারণ এর আগে তিন-চার মাস আমাকে এত, এত রকমের ও এত অনিচ্ছার কাজ করতে হয়েছে যে খাটিয়ে লোক হিশেবে ভূতের ভিত্তিহীন খ্যাতিতে আমি বিস্তর প্রমাণ-সমেত ন্যায্য অংশ দাবী করতে পারি। অথচ কাজ নেই ব'লে বিরসতাও নেই, বন্ধু স্বজনের রমণীয় সঙ্গ সব সময়ই পাচ্ছি। দিনের বেলায় দারুণ রোদ আর সন্ধের পরে অন্ধকার; অতএব আমাদের বেড়ানো বেশি হ'তো না, কিন্তু সেজন্য আমার কিছুমাত্র আপশোষ নেই, কারণ ঘরে ব'সেই সমস্ত বাইরেটাকে যেখানে ভোগ করা যায় সেখানে বেড়ানোর প্রস্তাব আমাকে বিশেষ লুব্ধ করে না। বরং ঘরে ব'সে বাইরেকে পাওয়াই আমার মনে হয় আইডিএল অবস্থা। সকালে আর সন্ধের আগে খানিক

ক'রে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব হ'তো, কিন্তু আমাদের ভ্রমণের পরিধি ছিলো খুবই সংকীর্ণ।

এর ব্যতিক্রম ঘটেছিলো একদিন মাত্র যেদিন ভোরবেলা উঠে চা না-খেয়েই বেরিয়ে পড়েছিলুম ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে কোপাই দেখতে। এ-অভিযানে মক্ষিরানি সঙ্গিনী হননি, তাতে তিনি সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছিলেন, কারণ ফেরবার পথটা আমার পক্ষে সুখের হয়নি, তাঁর পক্ষে দুঃসহ হ'তো। ক্ষিতীশবাবু দুর্দান্ত হাঁটিয়ে, সারা পথ (এবং পথ কিছু কম নয়) তিনি গান আবৃত্তি গল্প ও কৌতুকে আমাদের আমোদিত রাখছিলেন, কিন্তু ফেরবার পথে তাঁর স্বাভাবিক প্রমোদ-প্রতিভাও আমার ক্লান্তির কাছে হার মেনেছিলো, এ-কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। যা-ই হোক, কোপাই দেখলুম। দেখবার মতো কিছু নয়, শীর্ণ শুষ্ক একটি জলের ধারা, হাঁটু ডোবে না। পূর্ববঙ্গে একে খাল ব'লেও সম্মানিত করে না। তবু এ খালবিল নয়, রীতিমতো নদী, এই বিশুষ্ক অঞ্চলের একমাত্র সরস প্রাণস্রোত, বসন্তের তুষার-গলা স্নেহস্মৃতি এ-ই অতি কষ্টে বহন ক'রে এনেছে বীরভূমের তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে। এই কোপাইকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্য-কবিতার প্রতীক বলে মেনেছেন, 'পুনশ্চ'র প্রথম কবিতা দ্রষ্টব্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পদ্মার পাশে এরও স্থান রইলো।

ফিরে এসে শুনি কবি খবর পাঠিয়েছেন আমাদের যাবার জন্যে। তক্ষুনি ছুটলুম উত্তরায়ণে, চা-পান সেখানেই হ'লো। আমাদের দেরিতে ওঠার অভ্যাস নিয়ে কবি প্রায়ই পরিহাস করতেন। একদিন বুঝি বলেছিলুম, 'আপনার অসুবিধে না হ'লে আমরা ভোরে আসতে পারি,' উত্তরে বললেন, 'সকলের ভোর এক সময়ে হয় না, ভোর বলতে তোমরা কী বোঝো সেটা জানা দরকার।' আমি প্রত্যূষ-বিলাসী নই, সে-কথা সত্য, কিন্তু শান্তিনিকেতনে দু' একদিন থাকতে-থাকতেই আমার জীবনের এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটতে লাগলো—আমি ভোরে উঠতে লাগলুম। আপনিই ঘুম ভেঙে যেতো, আর জেগে উঠেই বিছানা ছাড়তে কষ্ট তো

হ'তোই না, বরং শুয়ে থাকাই অসম্ভব ঠেকতো। এর প্রধান কারণ এই যে খোলা হাওয়ায় আর অতল স্তব্ধতায় এত গভীর ঘুম হ'তো যে-রকম ঘুম কলকাতায় আমাদের খুব কমই হয়, আর তাছাড়া বাইরে শুলে ভোরের আলোই হয়তো ঘুম-ভাঙানিয়ার কাজ করে। শুধু যে ঘুম থেকে উঠতুম তা নয়, ওঠামাত্র প্রভাতী কর্তব্যগুলো পর্যন্ত সেরে ফেলতুম, তারপর ব'সে থাকতুম চায়ের আশায়। চা দিতে ওরা একটু দেরি করতো। ইতিমধ্যে সুধাকান্ত বাবুর লিপি এসে পৌঁছতো, 'গুরুদেব আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, আপনারা আসুন।' আমি ব্যস্ত হ'য়ে চায়ের তাড়া দিতুম, সঙ্গীদের ডাকাডাকি করতুম; কন্যাদের তাড়নায় মক্ষিরানির ঘুমের ব্যাঘাত হ'তো ব'লে তিনি একটু বেলায় উঠতেন, আর জ্যোতির্ময়বাবু, যিনি স্বগৃহে বেলা ন'টার আগে বিছানা থেকে নড়েনই না, তাঁকেও ওঠবার জন্যে খুব বেশি সাধ্য-সাধনা করতে হ'তো না।

সকালে কবির সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কাটতো, ফিরে এসে দ্বিতীয় বারের চা, তারপর একটু চিঠিপত্র লেখা, বই পড়া, কি স্রেফ গল্প। আগেই বলেছি সঙ্গীর অভাব ছিল না। অনিল চন্দ ও রানি চন্দ, কৃষ্ণ কৃপালানি ও নন্দিতা দেবী, ক্ষিতীশ রায়, সুধীর কর আর—শেষোক্ত হ'লেও অন্যূন—সুধাকান্তবাবু—এঁরা সবাই মিলে আমাদের দিনগুলি মধুময় ক'রে রেখেছিলেন। হাসি ঠাট্টা গান গল্প আলোচনা সব বিষয়েই আমাদের সচ্ছলতা। অনিলবাবু হৈ-হৈপ্রিয় ফুর্তিবাজ মানুষ, খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসেন, গলায় জোর আছে, এবং লোককে সেটা জানাতে কুণ্ঠা করেন না, রসিকতা ছাড়া তাঁর মুখে রা নেই, এদিকে রানি চন্দ মৃদুহাসিনী ও মৃদুভাষিণী, শ্যামলে-কোমলে খাঁটি বাঙালি মেয়ে। ক্ষিতীশবাবু শিশুচিত্তের জাদুকর এবং বয়স্ক মনেও তাঁর প্রভাব কম নয়। মুখে তাঁর হাসির অভাব নেই, আর অভাব নেই নানারকম বাচনিক ও ব্যবহারিক কৌশলের, গান আবৃত্তি যেমন তাঁর অনর্গল, মাথার উপর টুপি নাচানো কিংবা কাচের গেলাশে শব্দ চালান করাও তেমনি স্বচ্ছন্দ।

এদিকে আমাদের জ্যোতির্ময়বাবু জাদুবিদ্যায় পারদর্শী, কিন্তু এ-খবরটা প্রকাশ পেলো বড্ড দেরিতে, তখন আমাদের চ'লে আসবার মাত্র দু'দিন বাকি। কিন্তু ঐ দু'দিনেই ক্ষিতীশবাবু তাঁর কাছ থেকে অনেকগুলি ভেলকি আয়ত্ত ক'রে নিলেন, শুধু তা-ই নয়, শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার আগেই আমাদের সেগুলো দেখাতে গিয়ে প্রচুর আনন্দের জোগান দিয়েছিলেন, তবে সে আনন্দে কলহাস্যের মাত্রাটা কিছু অধিক ছিলো, সাধারণত ম্যাজিক দেখে অতটা হাসি পায় না। আশা করা যায় আমরা চ'লে আসার পরেও আশ্রমবাসীদের অনুরূপ আনন্দ দিতে তিনি ছাড়েননি, এবং ছুটির পরে বিদ্যালয় খুললে ছোটো ছেলেমেয়েদের ক্লাশে নবার্জিত বিদ্যাবলে তিনি একেবারে হুলস্থুল বাধিয়ে দেবেন তাতেও সন্দেহ নেই।

অনিলবাবু আর ক্ষিতীশবাবুর সংযোগে হাসির তুফান উঠতো, আর উঠতো নন্দিতা দেবীর উপস্থিতিতে। কবির এই দৌহিত্রীর উজ্জ্বল সজীব কৌতুকপ্রিয়তায় আনন্দের দক্ষিন-দুয়ার যেন খুলে যেতো, আর তারই পাশে কৃপালানির বুদ্ধি-দীপ্ত ঈষৎ-গাম্ভীর্য হ'তো সুশোভন। ঠাট্টা তিনি উপভোগ করেন, কখনো-কখনো রচনাও করেন, কিন্তু মুখে একটি সহাস্য অথচ নির্লিপ্ত ভাব সর্বদাই আছে; তিনি স্বল্পভাষী ও মৃদুভাষী, আর সেই সঙ্গে যে-কোনো প্রসঙ্গ আলোচনায় উৎসাহ। তিনি কিছুটা দিলীপ রায়ের মতো দেখতে ব'লে তাঁকে প্রথমে দেখেই ভালো লেগে-ছিলো, তারপর তাঁর আন্তরিক পরিচয় যখন পেলুম, দেখা গেলো ভালো লাগবার আরো অনেক কারণ আছে, প্রিয়দর্শিতার চাইতে তা গভীর।

বোধ হয় রবীন্দ্রনাথেরই প্রভাবে শান্তিনিকেতনে হাস্য-কৌতুকের চর্চা খুব বেশি। কবি তাঁর রচনায় কোনো চরিত্রের বর্ণনায় প্রায়ই বলেন, 'লোকটি হাসতে জানে', কিংবা 'লোকটি ঠাট্টা করলে বোঝে'। এ-কথা তাঁর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা-প্রসূত ব'লেই মনে হয়, কেননা হাস্যস্পর্শহীন নিদারুণ বিজ্ঞতা তিনি জীবনে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই, ছিন্ন পত্রে তার উল্লেখ আছে। আর কড়া মেজাজের গাম্ভীর্যকে হাসির খোঁচায় ফুটো করেছেন গল্পগুচ্ছের পাতায়-পাতায়। স্কচজাতি সম্বন্ধে ইংরেজের

প্রচলিত বচন আছে: 'স্কচকে ঠাট্টা বোঝাতে হ'লে অস্ত্রোপচারের দরকার।' এর উত্তরে স্কচ হাস্যকার ব্যারির একটি নাটকের নায়ক বলছেন, 'অস্ত্রোপচার ক'রে ঠাট্টা বোঝানো যায় কেমন ক'রে তা-ই তো আমি বুঝতে পারছি না।' অতল হাস্যহীনতার এ-রকম দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও যে মাঝে-মাঝে দেখা না যায় তা নয়। রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন প্রথম থেকেই, এবং তাঁর আশ্রম অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কৌতুকেও সম্পদশালী, দেখে অতিথিমাত্রেরই ভালো লাগে। ক্ষিতিমোহনবাবুর কথকতা-প্রতিভা তো বিখ্যাত, সুধাকান্ত-বাবুও দেখলুম 'পন্' না-ক'রে প্রায় কথাই বলতে পারেন না, আর রবীন্দ্র-জীবনের নানারকম আখ্যান তিনি যখন বলেন তখন আবেগের সঙ্গে কৌতুক মিশ্রিত হ'য়ে এক বিচিত্র রসের সৃষ্টি হয়। দুপুরের অলস ঘণ্টা তাঁর এ-সব গল্পে মাঝে-মাঝে উজ্জীবিত হ'য়ে উঠতো।

দুপুরবেলা আমরা আর-একজনের সঙ্গ পেতুম—তিনি সুধীর কর। এঁর মতো লাজুক মানুষ আমি কখনো দেখিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক সম্বন্ধে একজন ইংরেজ একবার বলেছিলেন যে লোকটি 'magnificently shy': কোনো-কোনো মানুষের মধ্যে লজ্জা-শীলতারও একটা চরিত্রধর্ম প্রকাশ পায়, এ-কথা ঐ অধ্যাপক আর সুধীর-বাবুকে দেখে বুঝেছি। শান্তিনিকেতনে আগের বারে এসে সুধীরবাবুর আপিশের পাশের ঘরেই থেকে গিয়েছি, কিন্তু তিনি কখনো দেখা দেননি। এবারেও প্রথম যেদিন তিনি এলেন, এসে বললেন, 'গুরুদেব আমাকে বলছেন আপনাদের খোঁজ-খবর নিতে—খোঁজ-খবর অবশ্য অনেকেই নিচ্ছেন—তবু তাঁর কথা রাখবার জন্যে এলাম। আপনার সঙ্গে মৌখিক আলাপ নেই, যদিও চিঠিপত্রে—'। আমি বললুম, 'আপনি সুধীরবাবু তো?' তারপর অনেকক্ষণ আলাপ হ'লো। যাবার সময় বললেন, 'আপনাদের এখানে আসবার সময় সারা পথ এই ভাবতে-ভাবতে এসেছি যে গিয়ে প্রথম তো খোঁজ-খবর নেবার কথাটা পাড়বো, কিন্তু তারপর কী বলবো?' পরে অবশ্য দেখা গেলো যে কোনোপক্ষেই প্রসঙ্গের অভাব

নেই, এবং সুধীরবাবু তাঁর অবসর সময়ের প্রায় সমস্তটাই কাটাতেন আমাদের সঙ্গে। খদ্দর পরা, পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা, বইখাতা হাতে—তাঁর এই চেহারাটি ছবির মতো চোখে ভাসে। দুপুরবেলা তিনি মক্ষিরানিকে গান শেখাতেন ; ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরের নির্জন প্রহরে আমাদের বিশ্রাম সরু-মোটা গলার সুরে মদির হ'য়ে উঠতো। আরও অনেকে যখন থাকতেন, হালকা কথার ঘাত-প্রতিঘাত চলতো, সুধীরবাবু সাধারণত মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে থাকতেন, কিন্তু নিভৃতে তাঁর মুখ ফুটতো সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনায়। বিকেলে চায়ের পরে একটু বাইরে বেরোতুম, কবি যেদিন বাইরের বারান্দায় এসে বসতেন তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হ'তো। সন্ধ্যায় আমাদের আড্ডা বসতো বাইরে আকাশের তলায় চেয়ার টেনে এনে ; আকাশ তারায় ভ'রে যেতো আর আমাদের মন ভ'রে যেতো গানে গল্পে আনন্দে। নন্দিতা দেবীর মুখে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গান শোনা হ'লো ; তাছাড়া ছিলেন সংগীত-ভবনের দু' একজন ছাত্র-ছাত্রী, তাঁদের আচরনেরও কৃপণতা ছিলো না। কয়েকটি গান মগজে গুনগুন ক'রে ফিরছে—ভুলতে পারছি না।

আর একজনের কথা না-বললে এ-কাহিনী সম্পূর্ণ হয় না। তিনি মিস্ পেটিট, রতন কুঠিতে আমাদের প্রতিবেশিনী। পার্সি মেয়ে, এখানকার কলাভবনের ছাত্রী, চাল-চলন সাজসজ্জা পুরো বিলিতি। তাঁর ব্যবহার যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি মার্জিত ; অতি অল্প সময়েই তাঁর সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্য স্থাপিত হ'য়ে গেলো। প্রথমে আমি তাঁকে অর্ধ-শ্বেতাঙ্গিনী ভেবেছিলুম, কিন্তু অনতিপরেই যখন শুনলুম তিনি আর-একজন অবাঙালিকে 'চন্দ' নামটির নির্ভুল উচ্চারণ শেখাচ্ছেন তখনই বুঝলুম তিনি ভারতীয়া। তাঁর মুখে ভাঙা-ভাঙা বাংলা ভারী মধুর শোনাতো, এবং আমরা তাঁর সঙ্গে যথাসম্ভব বাংলাতেই কথোপকথন চালাতুম, একদিন অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে তাঁর মুখে রবীন্দ্রনাথের একটি গান শুনে নিয়েছিলুম পর্যন্ত। সারাদিন তিনি নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন—মাঝে-মাঝে ফাঁকে-ফাঁকে জ্যোতির্ময়বাবুর সঙ্গে চলতো তাঁর

চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা—তবে রাত্রে খাবার টেবিলে তাঁর দেখা পেতুম, আর কোনোদিন বা সন্ধ্যায় কোনোদিন বা রাত্রে খাওয়ার পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের গল্প জমতো। গল্প বলবার স্বাভাবিক ক্ষমতাই তাঁর আছে, আর তাঁর মুখে যে-সব কাহিনী শুনেছি তা থেকে প্রমাণ হয় যে তাঁর বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও সাহস দুর্দান্ত—পরে জানলুম যে সাহসের জন্য তাঁর যথেষ্ট খ্যাতিই আছে শান্তিনিকেতনে। রতন কুঠিতেই তিনি বারো মাস থাকেন, কখনো কখনো ছুটিও এখানে কাটান, তখন হয়তো একেবারে একা থাকতে হয়। মাঠের মধ্যে এই প্রকাণ্ড বাড়িতে একা কাটানো—তার উপর রাত্রে বাইরে শোয়া—এ-কথা ভাবতেই বঙ্গীয় সমাজে অনেকেরই বুক কাঁপবে। বিপদ যে তাঁর একেবারে না ঘটেছে তাও নয়, কিন্তু তা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন সম্পূর্ণ আত্মশক্তিতে নির্ভর ক'রেই; জগতে যেন কোনোরকম ভয়ের কারণ নেই এই রকম নিঃসংশয় দৃপ্ত তেজে তিনি সর্বদা চলাফেরা করেন, আর এতে যে প্রশংসনীয় কি উল্লেখযোগ্য কিছু আছে সে-বিষয়েও তিনি সচেতন নন। আমরা আন্তরিকভাবেই তাঁর সাহসের তারিফ করতুম, কিন্তু তিনি বলতেন, 'কেনো বলুন তো? আমাকে সোবাই বোলে—আপনার কী সাহস! কেনো, সাহসের আমি কী করেছি? ভোয়টা কিসের? সাপের ভোয়? ভুতের ভোয়? চোর-ডাকাতের ভোয়?' অবস্থাভেদে ও ব্যক্তিভেদে ভয় যে সবগুলিরই, এমনকি সব-কিছুরই, এ-কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত বোধ করতুম। নির্ভীকতার দিক থেকে ইনি বঙ্গমহিলাদেরই শুধু নয়, অনেক পুরুষেরও দৃষ্টান্তস্থল।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শিশু

রাত্রে খাওয়ার পর বেশিক্ষণ আড্ডা জমতো না, বড়ো ঘুম পেয়ে যেতো। আমাদের পক্ষে মধুর এ-নিদ্রাতুরতা, কারণ কলকাতায় বছরের বেশির ভাগ দিনই আমাদের ঠিক ঘুম পায় না, শরীর ক্লান্ত হয় মাত্র, তখন শুতে হবে ব'লেই শুতে যাই। একদিকে সারাদিনের স্নায়বিক নিপীড়নে, অন্যদিকে গরমে ও গোলমালে ঘুমের স্বাভাবিক গভীর সস্নেহ চেহারাটি আমরা প্রায় ভুলেই থাকি। শান্তিনিকেতনে শুতে যাওয়াটা আমার প্রতি রাত্রিই মনে হ'তো মহার্ঘ বিলাসিতা। রাত্রে হাওয়াটা ঠাণ্ডা হ'তো; হু-হু হাওয়ার মধ্যে, পাৎলা মশারির ফাঁকে বিরাট উন্মুক্ত আকাশের তারা দেখতে-দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই গহন ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতুম। কোনো-কোনো রাত্রে হাওয়ার জোর এত বেশি হ'তো যে কিছুতেই মশারি রাখা যেতো না; মক্ষিরানি তখন তাঁর একখানা শাড়ি দু'ভাঁজ ক'রে পুবদিকে পরদা টাঙিয়ে দিতেন। দিনে যত গরমই থাক, রাত্রে ঠাণ্ডা হ'তোই, হাওয়ারও অভাব হ'তো না।

দিনের বেলাও গরম অসহ্য ঠেকতো না, কারণ পশ্চিম অঞ্চলের শুকনো নিঘাম চড়া উত্তাপ খাশ বাংলার সজল কোমল গ্রীষ্মের চাইতে ভালো। ক্লেশকর বেশি, কিন্তু এত ক্লান্তিকর নয়। এই যে এখন ব'সে-ব'সে লিখছি মনে হচ্ছে ঘামতে-ঘামতে সমস্ত শরীর কাদা হ'য়ে গেলো, কালকের কামানো দাড়ি সমস্ত মুখে আলপিনের মতো ফুটছে, অথচ বাইরে রোদ নিস্তেজ, তাপমানযন্ত্রে একশো ডিগ্রির কমই হবে। এর চাইতে ভালো চড়া রোদ্দুরে শুকনো তপ্ত হাওয়ার ঝলক। এ-বিষয়ে অবশ্য মক্ষিরানির মত আমার সঙ্গে মেলে না। খাওয়ার পরে রোজই তিনি কখনো বিছানায় কখনো পাটিতে কখনো অনাবৃত মেঝেতে

গড়াতেন, আর নানারকম বিলাপ-বাণী উচ্চারণ করতেন—তিনি চাইতেন দরজা-জানলা বন্ধ রাখতে, এদিক আমি বলতুম, না না, খোলাই থাক—কেননা অবরোধে কাৎরানোর চাইতে খোলা হাওয়ায় ঝলসানো ভালো। এ-নিয়ে প্রত্যহই কিছু অশান্তি হ'তো, তার বিস্তৃত বিবরণ না-ই দিলাম। অগত্যা মক্ষিরানি হয়তো বারান্দায় এসেই শুতেন, আমি কিছু শুয়ে কিছু লিখে কিছু গল্প ক'রে দুপুরটা কাটাতুম। খুব হাওয়া, সে-হাওয়ায় যেমন জোর তেমনি তাপ, যেন বিশ্বকর্মার কারখানার বিরাট হাপরের নিঃশ্বাস। তবু তো হাওয়া, কম্বল-চাপা দম-আটকানো ভাবটা নেই। এইভাবে বেশ কাটছিলো, হঠাৎ একদিন গুমোট নামলো। হাওয়া মাঝে-মাঝে একেবারে প'ড়ে যায়, মাঝে-মাঝে জেগে ওঠে, কিন্তু তেমন উৎসাহ যেন নেই। সেই সময়ে গরমটা অন্যদিক থেকে উপভোগ্য হয়েছিলো, এও একরকমের অভিজ্ঞতা। একে বলা যেতে পারে গ্রীষ্মের তুরীয়ানন্দ। যেখানেই হাত দিই—টেবিল-চেয়ার, কাপড়-চোপড়, রুমাল, বই, সিগারেটকেস, নিজেদের মাথার চুল—সব তেতে আগুন হ'য়ে আছে। এ একটা জীবন্ত অনুভূতি, এ-উত্তাপ যেন কোনো স্পর্শসহ পদার্থ, মনে হয় একে পকেটে ক'রে ব'য়ে বেড়ানো যায়, অনেক টুকরো ক'রে ভেঙে সকলের হাতে-হাতে দেয়া যায়। কলকাতায় বৈশাখ মাসের গরম এই ধরনের, কিন্তু তার এতখানি নিবিড়তা কখনোই হয় না।

সবাই বলতে লাগলেন, এবার শিগগিরই বৃষ্টি হবে। শান্তিনিকেতনে বর্ষা দেখবো, এ আমার অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষা। রোজই ভাবি বৃষ্টি হবে, রোজই নির্মেঘ আকাশে সূর্য ওঠে আর অস্ত যায়, কখনো চকিতে একটু ছায়াও পড়ে না। প্রায় হতাশ হ'য়ে পড়ছি এমন সময়—আমাদের চ'লে যাবার দু'দিনমাত্র আগে—বিকেলের দিকে বৃষ্টি এলো। বৃষ্টি যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি ঝড়। প্রথমে দেখলুম উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে লালচে রঙের একটা হিংস্র অতিকায় জন্তু তীব্রবেগে ছুটে আসছে—যেন নবীন আমেরিকার শূন্য প্রান্তরের' পরে ধাবমান বাইসনের

পাল। সঙ্গে-সঙ্গে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেলো—কী গভীর গম্ভীর নয়ন-মন-ডোবানো সে-কালো—উদ্দাম ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এলো লাল ধুলোর ঝড়, বাইরে দাঁড়ালে ছোটো-ছোটো তীরের মতো গায়ে বেঁধে। নিচে ধুলোর ঘূর্নি, কিছু উপরে শাদাটে ধোঁয়াটে পাৎলা মেঘ, আরো উপরে কালো গম্ভীর মস্ত মেঘের দল—এই তিন স্তরে বর্ষা ছুটে চললো উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পুবে। আকাশে, হাওয়ায়, আনন্দিত গাছগুলির ডালেপাতায় একটা হৈ-হৈ হুলুস্থুল। সে আসে, সে আসে। তারপর রিমিঝিমি আধো-অন্ধকারে বৃষ্টি এলো।

তখনো আমাদের বৈকালিক স্নান হয়নি। ভেবেছিলুম নবধারাজলেই স্নান ক'রে নেবো, বৃষ্টিতে ভেজবার এ-অপূর্ব সুযোগ। দু'একবার নামলুম মাঠে, নেমে উঠে এলুম। শেষ পর্যন্ত আমাদের বিবর্ণ শহুরে বুদ্ধিরই জয় হ'লো—বাইরে যখন ঝমঝম বৃষ্টি, আমি তোয়ালে নিয়ে অন্ধকার বন্ধ বাথরুমের দুঃসহ গরমে স্বল্প জলে স্নান ক'রে এলুম—সর্দি হ'লো না, এই নেতিবাচক ক্ষীণ সুখ ছাড়া আর কোনো সুখ তা থেকে পেলুম না।

যতটা জাঁকালো হ'য়ে এসেছিলো, সে-অনুপাতে নববর্ষার রঙ্গ কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'লো না। দেখতে-দেখতে বৃষ্টি থেমে গেলো, মেঘ কেটে গেলো, রেখে গেলো স্বচ্ছ নীল আকাশে একটি স্নিগ্ধ ঝিরঝিরে হাওয়া। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিলো; অবাক হ'য়ে দেখলুম সমস্ত বায়ুমণ্ডল কমলালেবুর রঙে রঙিন, আর তার ভিতর দিয়ে 'উদয়ন' বাড়িটির হলদে রং সুস্পষ্ট শুভ্রতায় রূপান্তরিত। এ-অপরূপ অস্ত-আভায় শুধু ঐ বাড়িটি নয়, আকাশ প্রান্তর গাছপালা যা-কিছু চোখে পড়লো সবই মনে হ'লো অলীক, অলৌকিক। আরো একটু পরে জাদুকর আলো গেলো মিলিয়ে, বৃষ্টি-ভেজা ফুলের গন্ধ নিয়ে নামলো রাত্রি।

শান্তিনিকেতনে এই একদিনই আমরা বর্ষা পেয়েছিলুম।

বর্ষার এই ঝাপট কন্যারাও খুব উপভোগ করেছিলেন সে কথাটা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের কলোচ্ছ্বাস ঝড়বৃষ্টির শব্দের

সঙ্গে মিশে এক অদ্ভুত সংগীত রচনা করেছিলো। গ্রীষ্মেও তাঁরা কিছুমাত্র ক্লেশের লক্ষণ দেখাননি, বরং, যদিও কিছু নিঃসঙ্গ, এই অবারিত উন্মুক্ত আবহাওয়ায় তাঁদের উল্লাস ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত। উত্তরায়ণ অঞ্চলটি শিশুবিরল, একমাত্র চন্দননন্দন অভিজিৎ অবাধ আনন্দে এখানে-ওখানে ভ্রাম্যমাণ, তাঁর সঙ্গে মানবিকার দু'চারবার সাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু বন্ধুতার সূত্রপাত হ'তে এত দেরি হ'লো যে ততদিন আমরা মালপত্র গোছাচ্ছি। মানবিকার প্রধান আকর্ষণ ছিলো রতন কুঠির প্রাঙ্গণে অতি বেঁটে একটি গাছ আর খাবার ঘরে পুরানো বেসুরো একটি পিআনো। তাঁর চড়বার আন্দাজ ডাল জগতে কোনো গাছের যে হ'তে পারে তা আবিষ্কার ক'রে তাঁর বিস্মিত উত্তেজনার শেষ নেই, কিন্তু অনেকবার লুব্ধ হ'য়ে কাছে গিয়েও পরীক্ষা ক'রে দেখবার সাহস বোধ হয় শেষ পর্যন্ত হয়নি। তবে পিআনোতে তিনি মাঝে-মাঝে টুংটাং করতেন, এবং ক্ষুদ্র ভগ্নীটি পাছে সে-গীতসুধা থেকে বঞ্চিত হয়, তাকে বসিয়ে দিতেন পিআনোটারই উপর—আমরা সতর্ক না-হ'লে একদিন নিশ্চয়ই কোনো দুর্ঘটনা ঘটতো। তবে কণিকা জ্যেষ্ঠার অনুগামিনী হ'য়েই থাকতেন এমন মনে করলে ভুল হবে—তিনি স্বাধীনা মনস্বিনীর মতো নিজের খেয়াল-মতো সারা বারান্দায় ছুটোছুটি করতেন—ক্ষুদ্র পা দু'টির ক্লান্তি ছিলো না, আর ক্লান্তি ছিলো না অনতিব্যক্ত কলকাকলির। কখনো এক সিঁড়ি নামতেন কিন্তু দু' সিঁড়িতেই থামতেন, বারান্দার ধার পর্যন্ত যেতেন, আর এগোতেন না—এমনি ক'রে জীবের আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তির লীলা বার-বার আমাদের সামনে প্রকাশিত হ'তো। মিস্ পেটিটের সুন্দর ক'রে সাজানো ঘরটি সম্বন্ধে উভয়েরই ছিলো প্রবল কৌতূহল—মানবিকা দরজার বাইরে ঘন-ঘন ঘোরাঘুরি করতে-করতে একদিন ঢুকেই পড়লেন, তারপর থেকে বহু ছবি দেখার বিনিময়ে গৃহকর্ত্রীকে নাকি মাঝে-মাঝে আবোল-তাবোলের ছড়া শুনিয়ে আসতেন এমন জনরব শুনেছি।

দুপুরবেলায় গরম কাঁকরের উপর দিয়ে হাঁটা ছিলো মানবিকার আর-একটি রোমাঞ্চ। আমাদের বাড়ির অনতিদূরে ছিলো ডাকঘর,

ছুটে গিয়ে সেখানে চিঠি ডাকে দিয়ে আসতে পারলে তিনি স্বর্গসুখ অনুভব করতেন। বয়স্ক লোকের মূঢ়তা বশে আমরা পরিচারিকাকে সঙ্গে দিতুম ছাতা নিয়ে—কিন্তু কোথায় বা ছাতা কোথায় বা কে, মুহূর্তে তিনি উধাও। টকটকে লাল মুখ নিয়ে ফিরে যখন আসতেন তক্ষুনি যদি তাঁকে আরো খানিকটা দূরে আরো একটু দুরূহ কাজ দিয়ে পাঠাতুম তা'হলে তিনি নিশ্চয়ই মনে করতেন—এতদিনে বাবার একটু বুদ্ধিসুদ্ধি দেখা যাচ্ছে। এদিকে আমাদের পরিচারিকা হাঁপাতে-হাঁপাতে দাপাতে-দাপাতে এসে লুটিয়ে পড়তেন—গরমে তিনি নাকি ম'রেই গেছেন। তাঁর দেহটি কিছু সুখী, কোনোরকমে একটু চোট লাগলে কেঁদে-কেটে অস্থির হন। শান্তিনিকেতনে এসে অন্য বিষয়েও তাঁকে কিঞ্চিৎ কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছিলো। প্রথম দিনেই তিনি বেঁকে বসলেন—এখানে আমি কিছু খাবো না। কেন, কী হয়েছে? পঞ্চাকে সবাই বাবুর্চি বলে—ওর রান্না তিনি মুখে তুলবেন না। আমরা যতই বোঝাই যে মানুষটি বিশুদ্ধ হিন্দু, যতই অন্য ভৃত্যটির পবিত্র কাশী নাম বার-বার উচ্চারণ করি, তাঁর সংশয় কিছুতেই কাটে না। শেষ পর্যন্ত তিনি কিছুতেই টললেন না, এবং নিজের হাতে কোনোরকমে একটু আলুসেদ্ধ ভাত রেঁধে একবেলা ক'রে খেয়ে অতি কষ্টে মহামূল্য জাত বাঁচিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন।

সন্ধ্যার পর আমরা যখন বাড়ি ফিরতুম দূর থেকে দেখতুম, বারান্দার পেট্রোম্যাক্সটি ঘিরে দুটি ছোটো মানুষ এক বৃদ্ধার সঙ্গে জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে আছে। সারাদিনের উচ্ছ্বসিত স্বাধীন আনন্দের পর এই শূন্য অপরিচিত প্রান্তরে সন্ধ্যার অবতরণ এদের মনে একটি বিষাদের ছায়া ফেলতো তা সহজেই কল্পনা করতে পারি। আমাদের দেখতে পেয়েই দুই কন্যা একসঙ্গে আনন্দধ্বনি ক'রে উঠতো—'মা—বাবা—মা', 'ম্মা—বা-ব্বা—কা-ক্কা।' মানব-হৃদয়ের এই এক চিরকালের গান।

আঁধার রাতে একলা পাগল

সেদিন নন্দিতা দেবী বলছিলেন : 'জানেন, ঐ ছাতিমতলায় একদিন—'

তিনি হঠাৎ থামতেই আমরা বললুম, 'কী, কী হয়েছিলো ?'

'ওখানে একদিন দ্বিজেন্দ্রনাথকে দেখা গিয়েছিলো। প্রায়ই নাকি দেখা যায়।'

'আপনি কখনো দেখেছিলেন ?'

'না। তবে একবার একটি ছেলে—থাক, না বললাম, অপনি আবার ভয় পাবেন।' (এটা মক্ষিরানিকে লক্ষ্য ক'রে।)

মক্ষিরানি ম্লান একটু হেসে বললেন, 'না, না, আপনি বলুন।'

'ছেলেটি নতুন এসেছে, রাত্রে গেস্ট হাউসের দোতলায় শুয়েছে। হঠাৎ মাঝ-রাত্তিরে সে নন্দবাবুর বাসায় এসে হাজির। কী ব্যাপার ? সে বললে, "আমি শুয়ে-শুয়ে দেখলুম গুরুদেব আমার মশারির চারদিকে ঘুরছেন, তারপর মশারি তুলে যেই উঁকি দিতে যাবেন আমি দিয়েছি ভোঁ দৌড়। এ-সব কী কাণ্ড !" তখন তাকে সবাই বললে, "তুমি ভুল দেখেছো। উনি গুরুদেব নন, গুরুদেবের বড়-দা।"

'তা দ্বিজেন্দ্রনাথকে কখনো দেখিনি—হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেলে ভালোই তো হয়।'

'তারপর জানেন—কয়েক বছর আগে সুরুলের পথে এক বাড়িতে—'

এ-গল্প শেষ ক'রে নন্দিতা দেবী বললেন, 'থাক, আর বলবো না। কিন্তু জানেন, দাদামশাইর শিলাইদার বাড়িতে একদিন ভারি মজা হয়েছিলো।'

এক-এক ক'রে অনেকগুলি ভৌতিক কাহিনী শোনা হ'লো। সভা

যখন ভাঙে-ভাঙে তখন তিনি বললেন, 'আচ্ছা, এইটে শুনুন—'

এর পর রোমাঞ্চ সিরিজ আরো খানিকক্ষণ চললো। তখন অন্ধকার হয়েছে, লক্ষ ক'রে দেখলুম মক্ষিরানির মুখ কিছু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ভৌতিক কাহিনীর তিনি অতি চমৎকার ক্ষেত্র, কারণ ভয় পাবার জন্য তিনি প্রস্তুত হ'য়েই আছেন। তাঁর এই দুর্বলতা যেদিন প্রকাশ পেলো, সেদিন থেকে নন্দিতা দেবী দেখা হ'লেই কোনো-না-কোনো রকম ভৌতিকর গল্পের সূত্রপাত করতেন, ক'রেই বলতেন—'না থাক, বলবো না—আপনি আবার ভয় পাবেন।' তারপর নানা অদ্ভুত উপাখ্যান শুনিয়ে ঠিক বিদায় নেবার আগে তিনি যে-গল্পটি বলতেন সেটি সবচেয়ে লোমহর্ষক। যাবার সময় বলতেন, 'আপনারা আবার ভয় পাবেন না যেন। এ-সব গল্প গল্পই।'

সেদিন সন্ধ্যাবেলা এ-সব গল্প হয়েছে, তারপর প্রতিমা দেবীর গৃহে নৈশভোজন সমাপন ক'রে বাড়ি ফিরে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসেছি। রাত্তির সাড়ে-দশটা হবে, চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়াটি দিচ্ছে, মেজাজ বেশ প্রফুল্ল। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব হচ্ছে! নানা কথার ফাঁকে-ফাঁকে মাঠের দিক থেকে একটা তারস্বর কানে আসছিলো। ও-পথ দিয়ে সাঁওতালরা যাওয়া-আসা করে, তাদের কথোপকথনের সুর স্বভাবতই বেশ চড়া, তাছাড়া খানিকটা যেন গানের ছন্দে বাঁধা। তাদেরই কেউ মাঠ পার হচ্ছে মনে ক'রে আমরা ও-দিকে কানই দিইনি। কিন্তু খানিক পরেই মনে হ'লো সেই তারস্বর এগোচ্ছেও না পেছোচ্ছেও না, ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে কিছুই দেখবার উপায় নেই; মন দিয়ে শুনলুম লোকটা কী বলে। প্রথমে মনে হ'লো বুঝি থিয়েটরের রিহার্সেল চলেছে। খুব নাটুকে সুরে গদ্যে পদ্যে মেশানো কতগুলো বিলাপ শোনা গেলো—'মা জননী, আমি কি তোর সন্তান নই, আমাকে কি খেতে দিবি না?' ইত্যাদি। একটু থামে, তারপর আবার শুরু হয়। মিনিট পাঁচেক চুপ ক'রে শুনলুম, ব্যাপারটা বিশেষ সুবিধের ঠেকলো না। অথচ ব্যাপারটা তলিয়ে না-দেখে তো শোয়াও যায় না।

অগত্যা পেট্রোম্যাক্সটা যথাসম্ভব উজ্জ্বল ক'রে বারান্দার একেবারে প্রান্তে এনে রেখে আমি আর জ্যোতির্ময়বাবু এগিয়ে গেলুম টর্চ হাতে নিয়ে। খুব বেশিদূর এগিয়েছিলুম তা বলতে পারিনে, আলোর সীমানা পার হইনি সেটা ঠিক। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা অদৃশ্য অনাহূত অতিথিকে লক্ষ্য ক'রে হাঁক দিলুম—'কে? কে ওখানে?' কণ্ঠস্বরে খুব একটা বীরত্বের ভাব ফোটাবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কতটা ফুটেছিলো নিজেরা বিচার ক'রে তা বলতে পারবো না। উত্তর হলো, 'আমি।' 'কে আমি? কী চাও এখানে?' তখন আস্তে-আস্তে লোকটি আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। শীর্ণ চেহারা, জীর্ণ কাপড়, হাতে হাতকড়া আছে, কিন্তু আটকানো নেই। যা সন্দেহ করেছিলুম তা-ই, লোকটি প্রকৃতিস্থ নয়। কবি আর পাগল এক জাতের জীব এ-কথা সবদাই শুনি, কিন্তু এই স্তব্ধ নির্জন রাত্রে একে ঠিক আত্মীয়ভাবে অভ্যর্থনা করতে পারলুম না, এমনকি একে দেখে খুব যে খুশি হলুম তাও বলতে পারিনে। জিজ্ঞেস করলুম, 'কী চাও এখানে?' 'আমি ঠাকুরকে দেখতে এসেছি।' 'কোন্ ঠাকুর?' 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' আমরা বললুম, 'তিনি তো এখানে থাকেন না। ঐ যে বড়ো বাড়ি দেখছো, সেখানে থাকেন ব'লে শুনেছি।' কথাটা এই আশায় বললুম যে উত্তরায়ণ অঞ্চলের কাছাকাছি গেলেই সে হয়তো প্রহরীর নজরে পড়বে, কিন্তু ও-কথা শোনা মাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখবার উৎসাহ তার যেন একদম মিইয়ে গেলো। বললো, 'আমাকে কিছু খেতে দেবেন?' 'আচ্ছা, এসো।'

তার উপর থেকে দৃষ্টি না-সরিয়ে আমরা কোনরকমে আবার বারান্দায় এসে উঠলুম, তাকে বললুম, 'তুমি বোসো, খাবার দিচ্ছি।' কয়েকটা আম ছিলো ঘরে, তা-ই দেয়া হ'লো। ইজি-চেয়ারে ব'সে-ব'সে ভাবতে লাগলুম এখন কী করা যায়। লোকটি দেখতে নিরীহ-গোছেরই, কিন্তু আস্ত একটা পাগল সামনে বসিয়ে রেখে তো আর ঘুমোনো যায় না। চাকররা কেউ এ-বাড়িতে শোয় না, কাছাকাছি

এমন কেউ নেই যাকে দিয়ে একটা খবর পাঠানো যায়। তার ভাব দেখে বরং মনে হ'লো যে এখান থেকে সে শগগির আর নড়ছে না। আম ক'টা খেয়ে আরো গ্যাঁট হ'য়ে বসলো। আরো আহার্য দিয়ে তাকে ব্যস্ত রাখতে পারলে আমরা খুবই খুশি হতুম, কিন্তু ঘরে আর এমন কিছুই নেই যা দেওয়া যায়। তাই তো, এখন কী করা? রোজ রাত্রে সান্ত্রিরা সমস্ত শান্তিনিকেতনে টহল দেয়, তারা বেরুলেই যা হয় ব্যবস্থা হবে এই মনে ক'রে চুপ ক'রে অপেক্ষা করতে লাগলুম। এ-সময়ে রোজই তারা বেরিয়ে পড়ে, আর আজ কিনা আমাদের দরকার, আজই তাদের দেখা নেই। মিনিটের পর মিনিট কাটে, না দেখি তাদের টর্চের আলো, না শুনি হুইস্‌ল্‌। ব'সেই আছি। অনতিদূরে মিস পেটিট অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন; ইতিমধ্যে জ্যোতির্ময়-বাবু একবার তাঁর বিছানার ধারে গিয়ে তাঁকে ডেকেছিলেন। 'ওঃ, ও পাগলা আছে, কিছু করবে না,' এই ব'লে পাশ ফিরে তাঁর আবার ঘুম। এদিকে আমাদের আঁধার রাতের অতিথিটির ওঠবার কোনো লক্ষণই নেই; তাছাড়া অনির্দিষ্টভাবে চ'লে যাওয়াটাও বাঞ্ছনীয় নয়, আমাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকলে ফিরে আসতে কতক্ষণ। অগত্যা আবার মিস পেটিটেরই শরণাপন্ন হওয়া গেলো; এবার মক্ষিরানি গিয়ে তাঁকে ডাকলেন, এবং 'পরিস্থিতি'টি বুঝিয়ে বললেন। মুহূর্ত পরে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হ'লেন কালো কিমোনো গায়ে মিস পেটিট। দৃপ্ত ভঙ্গিতে লাফিয়ে পড়লেন বারান্দা থেকে, আগন্তুকের কাছে গিয়ে বললেন, 'কী, তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করবে? চলো আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।' লোকটি প্রথমটায় বুঝি নীরব নিশ্চল হ'য়ে ছিলো। 'চলো চলো,—ওঠো আমার সঙ্গে', এই বলতে-বলতে তাকে একরকম জোর ক'রে তুলে হনহন ক'রে মাঠের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন পাগল সঙ্গে নিয়ে এই অসমসাহসিকা। আমরা দুই বঙ্গবীর পৌরুষের গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলুম।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য জ্যোতির্ময়বাবুও গেলেন মিস পেটিটের সঙ্গে

—শোভনতারক্ষা ছাড়া যাওয়ার আর-কোনই দরকার ছিলো না—এদিকে আমি রইলুম পারিবারিক পাহারায়। অল্প পরেই তাঁরা ফিরে এলেন উত্তরায়ণের দারোয়ানের হাতে অগন্তুককে সঁপে দিয়ে। বীরাঙ্গনার অভয় সান্নিধ্যে সে-রাত্রে আমাদের নিশ্চিন্ত ঘুম হ'লো।

পরদিন থেকে ব্যবস্থা হ'লো রাত্তিরে একজন মালি আমাদের বাড়িতে শোবে, আর সান্ত্রিরাও যে আমাদের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতো তাও টের পেতুম। তবে এ-রকম কোনো অপ্রত্যাশিত নৈশ আবির্ভাব আর হয়নি। সে-সময়ে বোধ হয় পাগলামির একটা হাওয়াই এসে-ছিলো, কারণ পরের দিনই আর-এক পাগলের পায়ের ধুলো পড়েছিলো উত্তরায়ণে। ইনি মেয়ে। বর্ধমান থেকে এসেছেন, কোলে একটি পোষা বেড়াল, রেলগাড়িতে কাপড়ের তলায় ঢেকে এনেছেন শিশুর মতো ক'রে। এসে খবর পাঠিয়েছেন, বৌঠানকে গিয়ে বলো জোড়াসাঁকো থেকে সরলা দেবী এসেছেন।' প্রতিমা দেবী এসে অবাক। পাগল হ'লেও তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি, খোঁজ-খবরও রাখেন দেখা গেলো, তাছাড়া ঘরের নানা সামগ্রীর উপর বেশ একটু দৃষ্টিও নাকি তাঁর ছিলো। শূন্য হাতে তিনি ফিরে যাবেন এমন বোধ হ'লো না, তাই কিছু টাকা দিয়ে পাগল বিদেয় করা হ'লো—একেবারে বোলপুর স্টেশনে নিয়ে গিয়ে রেল-গাড়িতে তুলে দেয়া পর্যন্ত।

একদিন শোনা গেলো রতন কুঠির রান্নাঘরের পথে নিমগাছের তলায় মস্ত এক গোখরো সাপের আস্তানা—চাকরদের চোখে নাকি প্রায়ই পড়ে, একদিন কাশী বুঝি আর একটু হ'লে মাড়িয়েই দিচ্ছিলো। এ-কথা শোনা যেতেই নানাদিক থেকে স্থানীয় সাপের গল্প অজস্রধারায় আমাদের উপর বর্ষিত হ'তে লাগলো? রতন কুঠিতে আমাদের ঘরেই একবার এক ভদ্রলোক ছিলেন, একদিন তিনি টেবিলে ব'সে কাজ করছেন, হঠাৎ উপর থেকে ঝুপ ক'রে কী-একটা পড়লো। চমকে তাকিয়ে ছাখেন, সাপ। উপরে তাকিয়ে ছাখেন, সেখানে আরো একটি উঁকি দিয়ে

রয়েছে। একদিন নাকি ক্ষিতিমোহনবাবুর ভোরবেলায় ঘুম ভেঙেছে, পাশ ফিরতেই খুব ঠাণ্ডা আর নরম কী-একটা জিনিষ হাতে ঠেকলো। দেখা গেলো, মস্ত একটি সাপ তাঁর পাশে দিব্যি আরামে শুয়ে। এই ধরনের আরো অনেক গল্প শুনলুম। একটি মেয়ে বললেন, 'একদিন রাত্রে শুতে যাবো, দেখি খাটের পায়ে একটা সাপ জড়িয়ে আছে। হুস্ করতেই সেটা পালিয়ে গেলো, শুয়েও পড়লাম, কিন্তু শুয়ে মনে হ'লো একটা সাপ ঘরের মধ্যেই নিয়ে ঘুমোনো কি ভালো হবে? উঠে লণ্ঠন নিয়ে সেটাকে খুঁজে বের করলাম, হাতের কাছে আর-কিছু ছিলো না—স্যাণ্ডেল দিয়ে পিটিয়ে সেটাকে মারলাম, তারপর এসে ঘুমোলাম।' আমরা জিজ্ঞেস করলুম তোমাদের সাপে ভয় করে না? মেয়েটি চোখ বড়ো ক'রে বললেন, 'করে না আবার! খুব করে! তেমন-তেমন সাপে কামড়ালে মানুষ তো আর বাঁচে না।' আসলে এখানে সাপ যেমন বেমন বেশি, সাপের ভয়ও তেমনি কারুরই নেই। অন্ধকারে বেরোতে হ'লে টর্চ একটা হাতে রাখেন এ-ছাড়া সাপের কথা কেউ ভাবেতন না, তাও দু' এক জনকে দেখেছি টর্চ ছাড়াই দিব্যি অন্ধকারে চ'লে যেতে। খাটে দেরাজে টেবিলের তলায় হঠাৎ সাপ দেখলে অবাক হবার কিছুই নেই, কেউ কিছু মনেই করেন না, তবে যথার্থ বিষাক্ত সাপ হ'লে রীতিমতো তোড়জোড় ক'রেই মারা হয়। ছেলেরা হেলে সাপ পকেটে নিয়ে ক্লাশে যায়, এবং তার নানারকম অসঙ্গত ব্যবহারও করে। চারদিকে সকলের নির্ভয় ভাব অতিথির মনেও নির্ভয় আনে। এত সাপের গল্প অন্য কোথাও শুলে নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিচলিত বোধ করতুম, কিন্তু শান্তি-নিকেতনে আমার মতো সর্পভীরু লোকেরও কোনো দুশ্চিন্তাই মনে আসতো না—মনে হ'তো এখানকার জীবন অত্যন্ত নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, কোনো অনিষ্ট এখানে হবে না। তাছাড়া সকলেই জানেন যে এত বছরের ইতিহাসে এই আশ্রমের এলাকার মধ্যে একটিও সর্পাঘাত হয়নি। নন্দলালবাবুকে একবার আর সুধাকান্তবাবুকে দু'বার সাপে অবশ্য কামড়েছিলো; কিন্তু সে অতি বাজে সাপ, তাঁদের কিছুই হয়নি।

তবু, একটি বিষধর আমাদের অত নিকট প্রতিবেশী এ-কথা শুনে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলুম বইকি। কবিকে পরিহাসছলে বলেছিলুম কথাটা, তিনি মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'ওরা কিছু বলে না।' কথাটি কানে লেগে রয়েছে, ওতে একটি অপূর্ব কোমলতা ছিলো। আরো অনেককেই বলেছিলুম, এবং মানুষের আর সাপের বাসা এত কাছাকাছি না-হওয়াই সঙ্গত এমন ইঙ্গিতও করেছিলুম। শোনা গেলো কাছাকাছি এক সাপুড়ে আছে, সে গর্ত থেকে জ্যান্ত সাপ ধরতে পারে। এ-রকম সাপ ধরার গল্প অনেক শুনেছি, কিন্তু চোখে কখনো দেখিনি। সাপের কামড়ে মরবার ভয়ে ততটা নয় যতটা সাপ-ধরা দেখবার উৎসাহে খবর পাঠালুম সেই সাপুড়েকে। দিন দুই পরে সকালবেলায় সে এলো। পূর্বোক্ত নিমগাছের কাছে একটা ইটের পাঁজা ছিলো। ইটের পাঁজা বাঁশবনের মতোই প্রসিদ্ধ সর্পাবাস, সাপুড়ে গুণে-টুনে বললে যে হ্যাঁ, সাপ আছে। ধরতে পারবে? পারবো। আরম্ভ হ'লো ওদের কাজ, আমরা সবাই পরম উত্তেজিত দর্শক। যে-কোনো মুহূর্তে ফোঁস ক'রে বিরাট ভুজঙ্গ মাথা তুলতে পারে মনে ক'রে আমরা প্রথমে একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিলুম, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেও যখন কয়েকটা ছুঁচোর বাচ্চা ছাড়া কিছুই বেরুলো না, আমরা সাহস পেয়ে কাছে গিয়েই দাঁড়ালুম। ইঁট সরিয়ে এখানে-ওখানে খোঁড়া হচ্ছে, গর্তের মতো কিছু দেখা যেতেই আমাদের হৃদয়ে আনন্দে-আতঙ্কে-মেশা কম্পন লাগছে—এইবার? দু'তিনটা গর্তের মুখে কাগজ পুড়িয়ে ধোঁয়া দেয়া হ'লো, একটার মধ্যে সুধাকান্তবাবু দর্শকদের রোমাঞ্চিত ক'রে হাত ঢুকিয়েও দেখলেন—কিন্তু কোথায় সাপ! বোধ হয় আমাদের অসৎ অভিপ্রায় টের পেয়ে সে আগেই পালিয়েছে। বেলা এগারোটা অবধি রোদ্দুরে পুড়ে ক্লান্ত হ'য়ে ফিরে এলাম ঘরে; মিস পেটিট ক্যামেরা হাতে নিয়ে আরো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। যক্ষুনি সাপ ফণা তুলে বেরুবে আর সাপুড়ে তাকে ঝাপটে ধরবে ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যামেরা বলবে ক্লিক। সাপের বিষয় নিয়ে মিস পেটিটের অনেকগুলো ছবি তোলা আছে, এটি হ'লেই পুরো

সিরিজ হয় তখন সচিত্র ইংরেজি প্রবন্ধ ফাঁদবেন এইরকম তাঁর মৎলব। কিন্তু তাঁকেও হতাশ হ'তে হলো। এর পরেও খোঁড়াখুড়ি খোঁজাখুঁজি চলেছে, কিন্তু খবর পেয়েছি যে রতনকুঠির সাপটিকে প্রকাশ্য দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করতে আজ পর্যন্তও রাজি করানো যায়নি।

এদিকে কবির কানে উঠলো যে আমরা সাপের ভয়ে গর্ত খোঁড়াচ্ছি। এ-প্রসঙ্গে তিনি আমাদের যে-ক'টি কথা বলেছিলেন তার মধ্যে পরিহাসের লঘুতা ছিলো না। আমাদের মানসিক শান্তি পাছে নষ্ট হয় সেজন্য তাঁকে উদ্বিগ্ন দেখলুম, আশ্বাস দিলেন নানাভাবে। বললেন, 'পায়ের কাছে একটা সাপ ফণা উদ্যত ক'রে উঠলে ভয় পাবার কিছু নেই তা বলিনে, কিন্তু সত্যি ওরা ওদের মনেই থাকে, মানুষের এলাকা মাড়ায় না, এখানে এতদিনের মধ্যে ওরা কাউকে কিছু করেনি। তোমরা যে-বাড়িতে আছো সেটায় আমি অবশ্য কখনো থাকিনি, কিন্তু তাছাড়া এখানকার প্রায় সব বাড়িতে সব অবস্থায় থেকেছি, সাপ দেখেছি অনেক, কিন্তু কখনো কোনো বিপদ ঘটেনি তা তোমাদের বলতে পারি। তোমাদের মানসপটে এখানকার যে-স্মৃতি বহন ক'রে নিয়ে যাবে তা থেকে সাপের ছবিটা বাদ দিয়ো।'

কথাগুলো শুনে অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করেছিলুম। নিজেদের মনে হয়েছিলো অপরাধী। একটা প্রাণীকে তার স্বাভাবিক আশ্রয় থেকে টেনে এনে বিপর্যস্ত করায় আমাদের যে-উৎসাহ তাতে কোথায় যেন একটা হীনতা আছে, তখনকার মতো তা আন্তরিকভাবেই অনুভব করলুম। সাপ সম্বন্ধে লরেন্সের কবিতাটি মিথ্যা নয়; জীবনের প্রভুদের প্রতি সভ্য মানুষের ব্যবহারে একটা মজ্জাগত ক্ষুদ্রতা ধরা পড়ে তাতে সন্দেহ নেই।

লরেন্সের ঐ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন কিনা জানি না, পড়লে তাঁর ভালো লাগবে। এবারে একটা জিনিস আবিষ্কার করলুম, তাঁর পশুপ্রীতি অসাধারণ। প্রচলিত অর্থে পশুপ্রীতি বললে ভুল হয়, জীবে দয়া বললেও ঠিক হয় না। দয়া সেটা মোটেও নয়, নিছক প্রীতিও

নয়; প্রাণের সমস্ত ব্যঞ্জনাই তার নিজের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় তাতে এই ভাবটাই সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট। লরেন্সের পশু পাখি পতঙ্গ বিষয়ক কবিতাগুচ্ছেরও মূল কথাটা এই। পশু পোষেন অনেকে, ভালোও বাসেন, বুনো জানোয়ার পোষ মানাতে কোনো-কোনো মানুষের অসামান্য দক্ষতার কথাও শোনা যায়, তাঁরা যেন পশু-জাদুকর, এদিকে অহিংস-ধর্মীদের উকুন-ছারপোকা দিয়ে নিজের শরীর শোষণ করাবার অনাচারের কথা ছেড়েই দিলুম। কিন্তু সমগ্র জীবজগতের প্রতি এই নির্লিপ্ত অথচ আন্তরিক অনুকম্পা সভ্য মানুষের মধ্যে বিরল, সেটা ধার্মিক কি পশুবিজ্ঞানীর চাইতে কবির পক্ষেই বেশি সম্ভব মনে হয়। দ্বিজেন্দ্র-নাথের হাত থেকে পাখিরা এসে খাবার খেয়ে যেতো, আর কাঠ-বিড়ালিরা তাঁর গায়ের উপর দিয়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতো এ-কথা সকলেই জানেন। প্রাণী-লোক সম্বন্ধে এই গভীর অনুভূতির আভাস পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথেরও চরিত্রে। তাঁর মুখেই শুনলুম যে একবার ইওরোপে এক স্থপতি তাঁর একটি মূর্তি গড়েন, তাতে কবির কাঁধে চড়িয়ে দেন এক কুকুর। 'কী, না আমি পশু ভালোবাসি।'

সাপের বিষয়ে কবির সঙ্গে কথা হবার পরে শুনলুম যে সাপ মারা তিনি পছন্দই করেন না। একবার অনিলবাবুর বাড়ির দেয়াল বেয়ে একটা সাপ উঠেছিলো, তখন কবি থাকতেন 'শ্যামলী'তে। তাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করতেই কবি বাধা দিয়ে বললেন, 'আহা—থাক না। ও আপনিই চ'লে যাবে।' তখনকার মতো সবাই ভালোমানুষ সেজে রইলো, কিন্তু একটু পরে কবি যেই স্নানের ঘরে ঢুকলেন অমনি শুরু হ'লো আক্রমণ, এবং বলাই বাহুল্য, সাপটির আয়ু অচিরেই ফুরিয়েছিলো।

সব-পেয়েছির দেশ

কলকাতার জীবনে বাঁধা সময়ে বাঁধা কাজের অবিরাম উৎকণ্ঠার পরে, সাহিত্যিক বাকবিতণ্ডার, সামাজিক আচার-ব্যবহারের অফুরন্ত স্নায়বিক টানা-হেঁচড়ার পরে, জীবিকা-অর্জনের ঘৃণ্যতা আর জীবন-রচনায় পদে-পদে ব্যর্থতার পরে শান্তিনিকেতনে এসে কী যে ভালো লাগলো। মনে হ'লো মুক্তি পেলাম, জীবনকে ফিরে পেলাম। তর্ক নেই, উত্তেজনা নেই, মনস্তাপ নেই— কর্মক্ষেত্রের রক্তশোষক নিপীড়ন নেই অথচ কর্মজগতের জাগ্রত সচেতন মনোভাব আছে। এখানে আকাশে বাতাসে পাখির গানে ইন্দ্রিয় নন্দিত হয়, হৃদয় মধুরতায় ভ'রে যায়, আবার বুদ্ধি-বৃত্তিতে নিদ্রালুতা আসে না, ইচ্ছে করলেই তার চরম চর্চা করা যায়। নির্জনতার অভাব নেই, গুণীজনসঙ্গও আছে হাতের কাছে। নগরের হৃদয়হীনতা নেই, নগরের নৈর্ব্যক্তিতা আছে। পাড়াগাঁর ধূর্ত কুটিলতা নেই, অনাড়ম্বরতা আছে। শান্তিনিকেতন গ্রাম নয়, শহর নয়, ঠিক বাংলাদেশেও নয়' আবার ভারতের কোনো সুদূর অপরিচিত আশ্চর্য তপোভূমিও নয়, যদিও এক হিশেবে ভারতের সংস্কৃতিক রাজধানী বটে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে যা-কিছু মূল্যবান সব এখানে প্রকাশিত, কিন্তু তাতে মিশেছে নবীন ইওরোপের প্রাণপূর্ণতা। এখানে ভারতবর্ষ শুধু প্রকাণ্ড অনড় দুর্বোধ একটা আদর্শ হ'য়ে দাঁড়িয়ে নেই, ভারতবর্ষ এখানে জীবন্ত। সেটা ডেপুটি-মুন্সেফ-পুলিশম্যান-রায়বাহাদুর ইত্যাদিতে আকীর্ণ ইংরেজ-শাসিত ভারতবষ নয়, এ যেন যথার্থই আমাদের আপন, প্রকৃতই আমাদের শরীর-মনের স্বদেশ। এখানে এমন-কিছু দেখি না যাতে চোখ ধাঁধিঁয়ে যায়, এমন-কিছু শুনি না যাতে সাধারণ বুদ্ধিও ঘাবড়ে যেতে পারে—দেখা মাত্রই পরিচয়েব আলো জ্ব'লে ওঠে, মনে হয় এ তো

আমারই। এই যে আপনার ব'লে চিনতে পারা এ একটি অতি দুর্লভ চেতনা, কারণ আমাদের শহরগুলিতে মেকি বিলেতির অনুশাসনে জীবন নীরস ও বিকৃত এদিকে গ্রামেও সুখ নেই, কেননা গ্রাম ভালো লাগলেও গ্রাম্যতা দুঃসহ। জীবনরচনার একটি নিজস্ব শিল্প কোনো-একদিন আমাদের হয়তো ছিলো, তা আমরা হারিয়েছি, জীবন রচনা করতে ভুলে'ই গেছি, গোটাকয়েক টেবিল চেয়ার কিনে, খেলার মাঠে চেঁচিয়ে, সিনেমায় ম'জে, বড়োলোকের খোশামোদ ক'রে নিতান্ত এলো-মেলোভাবে আমরা জীবন কাটাই। শান্তিনিকেতনে দেখা যায় জীবনশিল্পের বাস্তবিক প্রয়োগ, এবং সে-শিল্প আমরা অচেতন মনেও নিজের ব'লে চিনতে পারি। কী-ভাবে বাঁচবো, কী নিয়ে বাঁচাবো, এ-সব প্রশ্নের একদিককার উত্তর আছে এখানে, যাঁদের মন অনুরূপ সুরে বাঁধা তাঁরা সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন।

এখানে এসে একটি বিষয়ে খুব স্পষ্টভাবে সচেতন হওয়া গেলো। অবাক হ'য়ে জানলুম যে আমি ভারতীয়। আমাদের প্রচলিত অভ্যস্ত জীবনে এ একটা কথার কথা মাত্র। ইওরোপীয়ের ইওরোপীয়ত্বের যেমন একটা স্পষ্ট চেহারা দেখতে পাই সে-রকম কোনো চেহারা আমাদের ভারতীয়ত্বের আছে কিনা তা-ই আমরা জানি না। এখানে এসে দেখলুম সেই চেহারা, আর এও দেখলুম যে চেহারাটা বেশ ভালোই। কলকাতায় ব'সে, প্রতিদিনের জীবনে কোন কাজটা আমরা করি যা ভারতীয় না-হ'লে করতুম না, তা খুঁজে বের করা শক্ত হয়; আমাদের জুতো জামা গৃহসজ্জা কায়দা-কানুন সবই বিবর্ণ, চরিত্রহীন। যারা জ্যান্ত জাত তাদের জীবনযাপনে একটা ছন্দ থাকে যা তাদের নিজেরই সৃষ্টি; আমরা বর্তমানে ম'রে আছি, আমাদের জীবন তাই বেতালা, বেসুরো। চাষার বৌ তার কুঁড়ে ঘর নিকিয়ে দরজায় ছোট্ট দু'টি সিঁদুরের ফোঁটা দেয়, সেটা বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু তার নিজস্ব সম্পদ—সেখানে সে সত্যি ভারতীয়। এদিকে শহুরে ধনী বিলেতি কায়দায় আঁকা মাঝারিগোছের তৈলচিত্রে ঘর সাজান, তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে ভাবের দিক থেকে তিনি দেউলে।

অথচ সিঁদুরের ফোঁটায় শিক্ষিত নাগরিকের তৃপ্তি হয় না, আধুনিক গৃহ ও গৃহস্থালির সঙ্গে তা মানায়ও না, কিন্তু তার বদলে কাকে ধরবো কোনটা নেবো তা ভেবে না-পেয়ে নানা আন্দাজি উপকরণে আয়োজনে আমরা ঘর বোঝাই করি, প্রাণের ভিতরে সত্যিকার কোনো প্রেরণা নেই ব'লে সবই হয় ব্যর্থ। এই নিঃস্বতার উদাহরণ আমাদের সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। আমরা ইংরেজের নকল ক'রে ক্লব করতে যাই, তা অচিরেই অধঃপতিত হয় তাসের আড্ডায় কি পরচর্চার আখড়ায় ; স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশায় আমাদের শখ আছে খুব, কিন্তু শক্তি নেই, মেয়েরা একদিকে আর পুরুষেরা অন্যদিকে জড়ো হ'তে দেরি করেন না, এবং আলাপ-আলোচনাও মাঝখানকার সীমান্ত অতিক্রম করে না। কিংবা আমরা বিলেতি গ্যালাণ্ট সাজি, মিস্ অমুককে হাতে ধ'রে খাবার টেবিলে নিয়ে বসিয়ে মিসেস অমুকের দিকে তাকিয়ে একটু হাসি। আমাদের জীবন মেকিতে ভরা ; তা নিয়ে আমরা কেউ-কেউ কখনো-কখনো কষ্ট পাই। এই মেকির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে কেমন ক'রে তার ইঙ্গিত মিলবে শান্তিনিকেতনে এলে। এখানকার গার্হস্থ্য জীবনে, এখানকার সামাজিক জীবনে আছে একটি ছন্দের সুষমা, যা আমাদের আপন, যা ভারতীয়।

কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে ন্যাশন্যাল নয়। এখানে উদার আন্তর্জাতিকতার হাওয়া বয়। জগৎ এখানে এসে মিলেছে। শান্তিনিকেতন কী ভাবে বিদেশিদের আত্মস্থ ক'রে নেয় সে একটা দেখবার জিনিশ। আত্মস্থ করে, কিন্তু আত্মসাৎ করে না। প্রবাদ আছে প্যারিসে ব'সে সব দেশের লোকই মাতৃভাষা ভালো লেখে, তেমনি শান্তিনিকেতন প্রত্যেকেরই জাতিগত বৈশিষ্ট্য ফোটায়, আর সেই সঙ্গে অন্য সকলের সঙ্গে দৃঢ় ক'রে তোলে তার মিলনের গ্রন্থি। নিজেকে চিনতে পারি ব'লে কাউকেই পর মনে হয় না। একই মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে সকলে প্রতিষ্ঠিত অন্যত্র এটি তত্ত্বকথা, এখানে প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিক সত্য। কারো উপরেই সন্দেহ কি অবজ্ঞা আসে না, সকলকেই বন্ধু মনে হয়। সঙ্গতি কি

যোগ্যতার সমস্ত তারতম্যের বাইরে শুদ্ধু মানুষ হিশেবে মানুষের যে-মূল্য তা এখানে স্বীকৃত, এর চেয়ে বড়ো কথা কি নেই। সামাজিক স্তরভেদে যে উপরিওলা, সে অধস্তনকে মানুষ ব'লেই গণ্য করে না, এই বণিক-শাসিত জগতের এটাই নিয়ম, কিন্তু এখানে মনুষ্যত্বের মৌল মর্যাদা থেকে এমনকি গৃহসেবকরাও বঞ্চিত নয়। অন্য সকলের মতো চাকররাও খাটে, কিন্তু তাদের খাটানো হয় না ; লক্ষ্য ক'রে দেখলুম তাদের উপর ফরমাসের চাপ খুব কম। দেখে খুব ভালো লাগলো যে মেয়েরা ঘরকন্নার ছোটো-ছোটো কাজগুলি নিজের হাতেই করেন। কথাটা উল্লেখ করলুম এই কারণে যে আজকাল একটু-অবস্থাপন্ন বাড়িতেই মেয়েরা নিজের হাতে প্রায় কোনো কাজই করেন না, পান পর্যন্ত চাকররাই সাজে, অথচ তার বদলে তাঁরা যে আরো উঁচু দরের কিছু করেন তাও নয়। শুয়ে ব'সে হাই তুলে নভেলের পাতা উল্টিয়ে দিন কাটে। এটা অস্বাস্থ্যকর ও অন্যায়। যে কাজ করবে না সে খাবেও না এ-নীতি যদি মেনে নেয়া যায় তাহ'লে আমাদের সামান্য-বড়ো চাকুরেগিন্নিদের পক্ষে কী বলবার থাকে যারা সারা দুপুর ঘুমোন, তারপর পাড়া-বেড়ানোয় গয়না-গড়ানোয় দিশি সিনেমায় যাদের জীবন কাটে ? ভেবে দেখতে গেলে এটা কোনো-রকমের জীবনই নয় ; গরমের দুপুরে চারদিকে তাকিয়ে বন্ধ জানলা যখন দেখি, আর মনে পড়ে যে এর পিছনে আছেন আমাদের সুষুপ্ত ললনাকুল, তখন মনুষ্যশক্তির এই দারুণ অপব্যয়ের কথা ভেবে মন-খারাপ হ'য়ে যায়। সব রকম অপরাধেরই হয়তো ক্ষমা আছে, অলসতার ক্ষমা নেই। আবার আজকালকার জগতে ঘাড়ে ধ'রে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে কাজ আদায় ক'রে নেবার যে-প্রথা, জীবন তাতে বিষাক্ত, প্রাণ মুমূর্ষু। ভালোবাসার কাজে যতই আনন্দ, অনিচ্ছার কাজ তত বড়োই শাস্তি। জীবিকা উপলক্ষ্যে যত কাজ আধুনিক মানুষকে করতে হয় তা সবই প্রায় অনিচ্ছার কাজ, তার পিছনে আছে জবরদস্তি, দুঃশাসনিক কঠোরতা, আর তারই জন্যে যে-কাজে মানুষ বাঁচে, সে-কাজই আজ মানুষকে মারছে। আমাদের দেশে এ-বিষয়ে বরং মেয়েদেরই সুবিধে,

কারণ আপন গৃহ একাধারে তাঁদের লীলাক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র ; এই ক্ষেত্রটি মাইনে-করা চাকরের হাতে তুলে দিয়ে স'রে দাঁড়ানো, এ হ'লো অনর্থক আত্মবিসর্জন।

এখানে দেখলুম কাজ যা হওয়া উচিত তা-ই, অর্থাৎ সমগ্র জীবন-যাপনের ছন্দের একটা অংশ। এখানকার কাজে আছে খেলার আনন্দ, আছে ব্রতপালনের আন্তরিকতা। বিনম্র বাধ্যতা আছে, রক্তচক্ষু বাধকতা নেই। কেউ অলস নয়, আবার কাজের চাপে কেউ হাঁপিয়ে উঠছে এমনও মনে হয় না। জীবন সহজ ও স্বচ্ছন্দ ; কাপড়চোপড়ের হাঙ্গামা নেই—যা খুশি পরলেই হ'লো, যেমন খুশি বেরিয়ে পড়া যায় যে-কোনো মুহূর্তে। বেরোবার জন্য যে সাজতে হয় না এটা আমি বলবোই মস্ত বাঁচোয়া। শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠান আছে, কায়দাকানুনের কড়াকড় নেই। কারো সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে হ'লে এগিয়ে গিয়ে কথা বললেই হ'লো —দূরে প'ড়ে রইলো ইনট্রোডকশন। সব মানুষই আত্মসম্মানিত, মনুষ্যত্বই পরস্পরের মিলনক্ষেত্রে, মেলামেশা তাই অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর। মানুষের প্রাণ এখানে বিকশিত ; স্বাভাবিক মনুষ্যধর্মে জ্ঞানী কর্মী ছাত্র ছাত্রী সকলেই এখানে ধনী, তার কাছে ফ্যাকাশে ঠেকে কলকাতার ইস্ত্রি-করা নিখুঁত নির্ভুল ভদ্রতা।

এ-কথা মানতেই হয় যে শান্তিনিকেতন এক ধরনের সাম্য সৃজন করেছে ও কাজে খাটাচ্ছে। কাপড়চোপড় সকলেরই অতি সাধারণ। এটা শুনতে বিশেষ-কিছু নয়—বরং এর বিরুদ্ধেই বলবার ছিলো যদি এটা একটা ভঙ্গিমাত্র হ'তো। শহরের বড়োলোক যখন ছেঁড়া জামা প'রে বেরোন তিনি সেটা ভুলতে পারেন না, আর আমরা চারদিকে দাঁড়িয়ে কলগুঞ্জন তুলি—'দেখলি তো, কত পয়সা এঁর, অথচ কী সিম্পল।' এই বাহবাতেই ছেঁড়া জামার গ্লানি পুরিয়ে যায়। এদিকে গরিব যখন বাধ্য হ'য়ে ছেঁড়া জামা পরে, সে-ও সেটা ভুলতে পারে না, মনে হয় চারদিক থেকে অবজ্ঞার বাঁকা চোখ তার উপর পড়ছে, কোথাও

গিয়ে সসংকোচে দাঁড়ায়, কথা বলতে গিয়ে মুখ ফোটে না। কে বড়োলোক আর কে গরিব সে-কথাটাই এখানকার আবহাওয়ায় মনে থাকে না, জামা-কাপড়টা তাই দ্রষ্টব্যই নয়। তাই ব'লে বৈরাগ্যের অ-মানুষিক আদর্শও প্রচলিত নয়, সৌন্দর্যপ্রিয়তা নানাভাবে উৎসাহিত। প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিশ সুন্দর হবে, কিন্তু সে-সৌন্দর্যের নির্ভর বিত্তশালিতা নয়, তাকে রচনা করতে হবে আপন আন্তরিক প্রেরণায়, সহজ রুচিচেতনায়, শিল্পবোধে। সেটা কেনবার জিনিশ নয়, সেটা সৃষ্টি।

আসলে মানুষের মানুষিক বৃত্তিগুলিরই এখানে প্রাধান্য ব'লে বাইরের বৈষম্য চাপা পড়ে। তাছাড়া সাধারণ সাংস্কৃতিক স্তর খুব উঁচুতে, তাই কারো সঙ্গেই তেমন তীব্র আন্তরিক অনৈক্য অনুভব করতে হয় না। সংস্কৃতি যে স্বতঃই শ্রদ্ধেয়, শিল্পকলা যে স্বীয় মহিমাতেই বরেণ্য, এ-চেতনা এখানে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সাহিত্যিকের, শিল্পীর, যে-কোনোরকম মনীষাব্যবসায়ীর শান্তিনিকেতন তাই মানসগৃহ। চারদিকের মূঢ়তার, রুচিহীনতার ধূ-ধূ মরুভূমির মধ্যে এ একটি শ্যামল সরস গীতরঞ্জিত বনভূমি। আমরা সাহিত্যিকরা সাধারণত উৎপীড়িত ও অপমানিত জীবনযাপন করি এ-কথা বলতে বাধা নেই। যে-সমাজে আমাদের দিন কাটে সেখানে এ-কথা মনে করবার উপলক্ষ্য খুবই কম ঘটে যে সাহিত্য বা অন্য-কোনো শিল্পকর্ম করবার মতো কিছু। এ যে নেহাৎ একটা বাজে বদখেয়াল নয়, কোনো দিক থেকে এর কোনো-রকম সার্থকতা যে আছে কারো কথায় বা ব্যবহারে সে-রকম প্রকাশ পায় না। জীবনের সাংসারিক ক্ষেত্রে সাহিত্যিক ব'লে কেউ খাতির করবে সে-কথা ভাবাই যায় না, ওখানে বরং ওটা একটা অপবাদ, কেননা সাহিত্যিক মানেই অকেজো অপদার্থ লোক। 'ইনি সাহিত্যিক' —এই ব'লে যদি কাউকে পরিচয় করিয়ে দেয়া যায় তাহ'লে বেশির ভাগ শ্রোতার মুখে যে একটি অতল শূন্যতার ভাব ফুটে ওঠে তা দেখে নিজেকে রীতিমতো অপরাধী মনে হয়। এই একান্ত বিবর্ণ নিরপেক্ষতা তবু ভালো, কিন্তু কেউ-কেউ আছেন যাঁরা মহৎভাবে

একটু হেসে বলেন, 'ও, আপনি সাহিত্যিক! তা আমরা দেখুন সাত কাজে ঘুরি, সাহিত্য-টাহিত্যের খোঁজ রাখা সম্ভব হয় না, তবে হ্যাঁ—আপনার লেখা-টেকা দেখেছি বটে।' এ-কথা শুনে মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত, তবু রাখতেই হয়, ভদ্রতার দাবি এমনিই অন্যায়। কিঞ্চিৎ ধনবান ব্যাঙ্কওয়ালা কি ফিল্‌মওয়ালা কি দিগ্‌গজ জাঁকালো প্রোফেসর, এই ধরনের মহোদয়দের মধ্যে সাহিত্যিক সম্বন্ধে একটা তীব্র প্রতিহিংসা-বৃত্তিও মাঝে-মাঝে দেখা যায়—সত্যি হয়তো জাতে তারা উঁচু এ-ধারণা মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে না-পেরে সুযোগ পেলেই এঁরা তাদের অপমান করেন, সে-অপমান অনেক সময় উপকারের চেহারা নিয়েও আসে। এক কথায় বলতে গেলে, এই মধ্যবিত্ত সমাজে কবি কি শিল্পীকে প্রকাশ্য কি প্রচ্ছন্ন শত্রুতার আবহাওয়ায় দিন কাটাতে হয়। কথাটা খুব খোলাখুলিভাবে বললুম, কেউ কিছু করবেন না। সত্যি কথা, শিল্পকলা সম্বন্ধে যথার্থ উৎসাহী ব্যক্তি এত বড়ো কলকাতার শহরে ক'জন আর আছেন! এখানে গুণীজনের চাইতে বড়ো চাকুরের খাতির বেশি, আবার বড়ো চাকুরের চেয়েও বেশি খাতির বর্বর ব্যবসায়ী কি মেদাচ্ছন্ন জমি-দারের, টাকার মাপেই এখানে মানুষের মূল্য, এমনকি বেশ নামজাদা 'কলচর্ড' মহলেও তা-ই। আমরা তাই বাধ্য হ'য়েই নিজের একটি সংকীর্ণ দল বেছে নিয়ে তারই মধ্যে চলাফেরা করি। এটা অনেকে বলেন বটে অস্বাস্থ্যকর, কিন্তু আমি তো দেখি বাঁচবার এটাই একমাত্র উপায়। মানুষ মাত্রেই স্বধর্মী খোঁজে, সেটা প্রকৃতিরই নিয়ম ; অনুকূল পরিবেশ না-পেলে প্রাণ বাঁচে না। আমরাও যে যার সাধ্যমতো নিজেদের ঘিরে এমন একটি গণ্ডি রচনা করি, যেখানে নানা মতভেদ থাকলেও সাহিত্য শিল্পকলার সার্থকতা সম্বন্ধে সার্বজনিক স্বীকৃতি আছে। এটা আমাদের করতে হয় আত্মরক্ষারই প্রাকৃতিক তাগিদে, কারণ এটুকু অবলম্বন অন্তত না-পেলে আমাদের অস্তিত্বই যে শূন্য হ'য়ে যায়। এ-গণ্ডির বাইরে যখন যাই, যাই শক্ত খোলশ এঁটে, কারণ বাইরে দুঃসহ শূন্যতা। তবু কোনো খোলশই এমন শক্ত হয় না যে অনাহত অবস্থায়

বাড়ি ফেরা যায়। বরং অনুভূতিগুলো আমাদের কিছু সূক্ষ্ম ব'লে লাঞ্ছনাও সইতে হয় বেশি।

এই দুর্ভিক্ষের মধ্যে যদি কোনোখানে দেখি সচ্ছলতা, যদি খোঁজ পাই পরিপূর্ণ শিল্পীজীবনের, তার আকর্ষণ আমাদের পক্ষে দুর্নিবার। কলকাতায় যামিনী রায়ের কাছে গিয়ে এত ভালো লাগে এই কারণেই। চারদিকে ছবিতে-ঘেরা তাঁর ঘরগুলিতে মন যেন পরিপূর্ণ ক'রে নিজের মনের-মতোকে পায় সমস্ত পৃথিবী ভ'রে তীব্র তিক্ত যুদ্ধ—এখানে শান্তি, এখানে মুক্তি। আর-কিছু নয়, ব'সে-ব'সে শুধু এই বিশুদ্ধ আবহাওয়াটি উপভোগ করি, শিল্প এখানে চরম, শিল্পী হ'তে পারা কে কত বড়ো সার্থকতা চারদিকের দেয়াল তা নীরবে ঘোষণা করছে। সঙ্গেসঙ্গে নিজের আত্মসম্মানবোধ বাড়ে, নিজের মর্যাদায়—যা সাংসারিক জীবন প্রতি মুহূর্তেই তার নোংরা পা দিয়ে থেঁৎলে দিচ্ছে—বিশ্বাসী হ'তে শিখি। এই অনুকূল আবহাওয়াই আমরা চারদিকে খুঁজে বেড়াই, দৈবাৎ কোনো-খানে পেলেই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠি। শান্তিনিকেতনে দেখলুম জীবন আর শিল্পের আনন্দিত সমন্বয়। শিল্প এখানে শৌখিন বিলাসিতা নয়; বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষ্যে পরবার পোশাকি কাপড় নয়, এখানে জীবনই শিল্প, শিল্পই জীবন। এর মধ্যে বাইরের উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতির সুর-সংযোজনা চলেছে দিন-রাত্রিতে ঋতুতে-ঋতুতে, জীবনের ঐশ্বর্যে কোনো-খান দিয়েই ফাঁক নেই। গুণীজনের সম্মান স্বতঃসিদ্ধ। বিদ্যা তার নিজের গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়ায়, শিল্পকলার জন্য সবদিককার সবগুলি দরজা আছে খোলা—যে-কোনদিকে বুদ্ধিবৃত্তির সামান্য চর্চাও যিনি করেন, তিনিই এতে খুশি হবেন। অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে অপদস্থ যে-সাহিত্যিক, এখানে এসে সে পাবেই স্বীকৃতির স্বাক্ষর; এই একটা জায়গায় অন্তত শুদ্ধু সাহিত্যিক ব'লেই একজন মানুষ মূল্যবান।

নিজের কথা বলতে পারি। আমি যে সাহিত্যিক সেটা প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনে উল্লেখযোগ্যই মনে করি না, কেউ কথাটা পাড়লে লজ্জিত বোধ করি। আমার সে-পরিচয় অল্প কয়েকটি বন্ধুর কাছে।

আমার লেখা ভালো হ'তে পারে কি মন্দ হ'তে পারে, কিন্তু সাহিত্য আমি ভালোবাসি সে-কথা জোর ক'রেই বলবো, রচনায় শক্তির অভাব থাকতে পারে, ইচ্ছা কি উৎসাহের অভাব নেই। ব্যক্তিগত জীবনে আমার এই সাহিত্যবৃত্তি খুব অল্প কয়েকটি লোকের কাছে প্রকাশিত; কারণ এটা নিশ্চিত জেনেছি যে বৃহৎ জগতের কাছে এর কোনো মূল্য নেই। কিন্তু শান্তিনিকেতনে দেখলুম, আমি যে সাহিত্যিক তার কিছু-না-কিছু মূল্য সকলেই নিঃসংশয়ে স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন। রবীন্দ্র-রাজধানীতে এতে অবাক হবার কিছু হয়তো নেই, কিন্তু এটা যে খুব ভালো লেগেছে সেটা লজ্জা না-ক'রেই স্বীকার করবো। আমি যে-কাজ করি সেটা যে একেবারে অনর্থক নয়, তার যে কিছু সামাজিক মূল্য আছে, সেটা অল্প পরিসরের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য বুঝতে পারাও কম কথা নয়। একটা অবিমিশ্র সাহিত্য-শিল্পের আবহাওয়ার মধ্যে দিনগুলি কেটেছে, আমি তাতে পেয়েছিলাম উজ্জীবনী প্রাণ-রস। এ ক'দিন খবরের কাগজ পড়াও বাদ দিয়েছিলুম, কলকাতার ফুটবল আর ইওরোপের মহাসমর সম্বন্ধে থাকতে পেরেছিলুম অজ্ঞতায়। স্বীকার করবো এ-হাওয়া-বদলটা বড়োই স্বাস্থ্যকর লেগেছিলো।

পলায়ন ?

আমি নিশ্চিত জানি এখানে আমার প্রগতিশীল বন্ধুরা তুমুল আপত্তি তুলবেন। তাঁরা বলবেন এ-সব কথা আমার 'পলায়নী' মনোবৃত্তির পরিচায়ক, অর্থাৎ আমি চাই জীবন থেকে পালিয়ে হাতির দাঁতে গড়া চোরাকুঠুরিতে লুকিয়ে থাকতে, উনিশ-শতক-শেষের খেয়ালি কবিত্বের আমি জীর্ণ অপভ্রংশ মাত্র, এবং আমার মতো লেখককে একটুও প্রশ্রয় দিতে তাঁরা রাজি নন, সে-কথাও বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দেবেন। আমি এটুকু নিবেদন করতে চাই যে রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু কবিতা লিখলেই যদি এস্কেপিস্ট-কলঙ্ক ভঞ্জন করা যায় তা'হলে আমার পক্ষে চেষ্টা করা দুঃসাধ্য হয় না, কিন্তু সে-বিষয়ে বিশেষ ভরসা পাই না যখন দেখি যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—রাজনৈতিক রচনার যিনি অতুলনীয় ভাণ্ডার—ও-অপবাদ তাঁর'পরেও বর্ষিত হয়। তাহ'লে বলবার থাকে যে জীবন থেকে পালানো যখন সম্ভব নয়, আর জীবনের ক্ষেত্রও অনেক, তখন প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের ক্ষেত্রেই বিচার্য করা ভালো। আমি যদি কবি হই তাহ'লে কবি হিশেবে আমার কর্তব্য ভালো কবিতা লেখা, তাছাড়া কিছু নয়, জীবনের সঙ্গে সেই আমার যোগসূত্র। আমি যদি বাণিজ্য কি রাজনীতি সম্বন্ধে মূঢ় হই, ফুটবল কি ঘোড়দৌড়ের খবর না রাখি তাহ'লে ক্ষতি কী? আমি বরং বলবো, ভালো কবিতা লেখবার জন্যে যে-রকম জীবন আমার নিজের পক্ষে সব চেয়ে অনুকূল ব'লে জানি আমি চাইবো আমার জীবনকে সে-ভাবেই গড়তে, সেটা এস্কেপিজ্‌ম্‌ নয়, সেটা শুভবুদ্ধি। এখানেও কবিতে কবিতে প্রভেদ হবে; কেউ চাইবেন নির্জন আত্ম-নিমগ্ন জীবন, কেউ বা সামাজিক জীবনের

জটিলতা, অন্য কেউ হয়তো 'ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিল' থেকে প্রেরণা পাবেন—বেশির ভাগই কখনো এদিকে কখনো ওদিকে ঝুঁকবেন ; সম্পূর্ণ আত্মসংহৃত কি সম্পূর্ণ বহির্ব্যাপ্ত কোনো কবিই বোধ হয় নন, তবে বিশেষ-এক দিকে পক্ষপাত সকলেরই ধরা পড়ে—সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ তাগিদ হিশেবে ও-সবেরই সমান মূল্য, এর মধ্যে বিশেষ কোনো-একটিকে গ্রহণ না-করাটাই 'পলায়নী' মনোবৃত্তি এ-কথা বললে আর যা-ই হোক সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলা হয় না। এ-সব কথা যাঁরা বলেন তাঁদের সংজ্ঞা মেনে নিলে পৃথিবীর অনেক বড়ো কবিতেই এস্কেপিজ্‌ম্-এর লক্ষণ আবিষ্কার করা শক্ত হয় না, এবং সে-হিশেবে ঐ অপবাদ গ্রহণ করতে কোনো কবিরই আপত্তি হবার কথা নয়। আসলে অবশ্য কোনো ভালো কবিই এস্কেপিস্ট নন, হ'তে পারেন না, কারণ জীবনের কোনো-একটা দিক সম্বন্ধে গভীর আন্তরিক অনুভূতি তাঁর রচনায় ফুটছে ব'লেই তিনি কবি ব'লে স্বীকৃত। সেটা জীবনের কোন দিক হবে, অর্থাৎ তিনি কী বিষয়ে লিখবেন এবং কেমন ক'রে লিখবেন তা নিয়ে কোনো ফরমাশ চলে না, সেটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের উপরেই ছেড়ে দিতে হয়, পছন্দ না-হ'লে ঠেলে সরিয়ে রাখবার অধিকার তো সকলেরই রইলো। যাঁর রচনায় জীবনের যত বেশি দিক প্রকাশিত তিনি তত বড়ো কবি, যে-কারণে দান্তে শেক্সপিয়র রবীন্দ্রনাথকে মহাকবি ব'লে মানি। পরিধি যাঁর সংকীর্ণ তিনি ক্ষুদ্র কবি, কিন্তু কবি নিশ্চয়ই। ক্ষুদ্র কবিরও যথার্থ ভালো কবিতা যখনপড়ি তখন ঠিক সেই আনন্দই পাই যে-আনন্দ মহাকবির কোনো একটি বিক্ষিপ্ত কবিতায় কি কাব্যাংশে। এইজন্যে দেখি কয়েকটিমাত্র কবিতায় কত কবির খ্যাতির নির্ভর ; অতি সম্পদশালী সাহিত্যেরও এত সম্পদ নয় যে একটিও ভালো কবিতা ফেলে দিতে পারে। ভালো কবিতা লিখতে পারলেই কবি সার্থক, অন্য-কোনো কথাই ওঠে না।

এই হ'লো সাহিত্যের কথা। এখানে এস্কেপিজ্‌ম্-এর প্রসঙ্গ অবান্তর, কেননা সাহিত্য বলতে যা বুঝি তা জীবন সম্বন্ধে বিশেষ-কোনো

বাণী অবশ্যই বহন ক'রে আনে, জীবনের গভীর গহন হ'তেই তা উৎসারিত, তাই এস্কেপিস্ট সে কখনোই নয়। কোনো লেখা অপছন্দ হ'লেই যাঁরা ঐ শব্দটি প্রয়োগ করেন, তাঁরা বিদ্বান ও কৃতী ব্যক্তি হ'তে পারেন, কিন্তু সাহিত্যবিচার তাঁদের এলাকা নয়। তাঁরা সাহিত্যের বিষয়বস্তু মাত্র বিচার করেন, শিল্পকর্ম হিশেবে তাকে দ্যাখেন না। তাঁদের মনে বিশেষ একটা সামাজিক লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্য-সাধনের প্রয়োজনে কোন লেখা কতটুকু ব্যবহার্য তার বাইরে তাঁদের দৃষ্টি যায় না ব'লে যেটাকে অব্যবহার্য মনে হয় সেটাকে তৎক্ষণাৎ এস্কেপিস্ট কি রোম্যান্টিক কি ঐ রকম কোনো ছাপ মেরে অপাংক্তেয় করতে তাঁদের দ্বিধা হয় না। তাঁদের লক্ষ্য মহৎ সেটা স্বীকার করবো, কিন্তু সাহিত্য কি শিল্পকর্ম দ্বারা সে-লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে সেটা মনে করাই ভ্রান্তি। শিল্পরচনার আর সমাজরচনার জগৎ সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র। ছেলেবেলায় শুনতুম—তোমাদের লেখা দিয়ে কী হবে? তাতে কি দেশ স্বাধীন হবে? তার চেয়ে লণ্ঠন বানাও, কি গেঞ্জির কল কিনে বাড়িতে বসাও, তবু একটা কাজের মতো কাজ করবে। এ-কথা শুনে তখন খুব হেসেছি, কিন্তু আজকাল আবার ঐ আপত্তিই শোনা যাচ্ছে—তফাৎ শুধু এই যে এতটা খোলাখুলিভাবে কথাটা বলা হয় না, এবং বেশ খানিকটা পাণ্ডিত্যের প্রলেপ লাগিয়ে যেটা বলা হয়, তার মর্ম এই যে গেঞ্জির কল বসালে যে-ধরনের কাজ করা হয় সেই ধরনের কাজ তাঁরা সাহিত্য দিয়ে করাতে চান। বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার এই হাওয়াটা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো বাজে অঞ্চল থেকে আসছে না, এইটেই আরো পরিতাপের বিষয়। যাঁরা আমাদের হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়ে হাতুড়ি ধরাতে চেয়েছিলেন তাঁদের কথার জবাব দেবার দরকার হয়নি, কিন্তু যাঁরা কলমের ক্ষমতা স্বীবার করেন আর সেই সঙ্গে কলমকেই হাতুড়িতে পরিণত করতে চান তাঁদের সঙ্গে বোঝা-পড়া হয়তো অসম্ভব নয়, এই আশাতেই এতগুলো কথা লিখলুম। তাঁরা চান আমাদের দিয়ে তাঁদের কথা বলাতে, সাহিত্যকে প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক লক্ষ্যসাধনের অস্ত্র ক'রে তুলতে; কিন্তু এ-উপায়ে তাঁদের

উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হবার কোনো আশা নেই, অথচ সাহিত্যের ক্ষতির আশঙ্কা আছে। সে-সব লেখারই তাঁরা খুব বেশি তারিফ করেন, যেগুলো গল্পচ্ছলে প্রপাগাণ্ডা কিংবা কবিতার আকারে তত্ত্বকথা, তার মূল্য নেই বলি না, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়েরও মূল্য আছে, তবে সে-মূল্য সাহিত্যিক নয়। এ-সব যাঁরা লেখেন আশা করি তাঁরা সামাজিক লক্ষ্যসাধনের আগ্রহে দিন-রাত জ্বলছেন, কিন্তু তা-ই যদি হয়, গল্প-কবিতা লিখে যে কিছুই হবে না তা তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, কী করলে হ'তে পারে তাও জানেন, তবে সে-কাজ না-ক'রে খামকা কালি-কাগজ খরচ করেন কেন? তাহ'লে বলতে হয় যে কর্মক্ষেত্রে নামবার শক্তি কি ইচ্ছা তাঁদের নেই, সেইজন্যে অতি কঠোর ভীষণ কর্ম ছাড়া যা কখনোই সাধিত হ'তে পারে না, গরম-গরম কিছু লিখলেই তা যেন হ'য়ে যাবে, এই রকম একটা ভান তাঁরা সর্বদাই ক'রে থাকেন। অর্থাৎ কর্মক্ষেত্র থেকে পালিয়ে তাঁরা আশ্রয় নেন সাহিত্যের নিরাপদ প্রাঙ্গণে—সে-হিসেবে এস্কেপিস্ট যদি কোনো-কিছুকে বলা যায় তো তাঁদের প্রপাগাণ্ডিক রচনাকেই। অন্তত শিল্পরচনায় কলাকৌশলের কঠিন সংযম থেকে তাঁরা যে প্রায়ই পলাতক তাতে সন্দেহ নেই।

যাকগে এ-সব কথা। বলতে যাচ্ছিলুম, যুদ্ধ সম্বন্ধে দৈনন্দিন উত্তেজিত আলোচনা শুনতে হয়নি, আমার পক্ষে শান্তিনিকেতনের সুখকরতার এ-ও একটি কারণ। রাজনীতি আমি বুঝি না, যুদ্ধচালনার কূট-নীতি সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমার নেই—এই দুর্গত দাসদেশে গোটা কয়েক সরকারি চাকুরি নিয়ে যে-কাড়াকাড়ি কামড়াকামড়ি রাজনীতির নামে চলে, তাতেও কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। আমাদের দেশের চায়ের টেবিলের কিংবা মাসিক-ত্রৈমাসিকের মিলিটারি স্ট্র্যাটেজিস্টদের দেখলে আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে, যিনি দিবারাত্র যুদ্ধ ছাড়া আর-কিছু ভাবেনই না। ম্যাপ তার মুখস্থ, শাদা কাগজে পিন ফুটিয়ে-ফুটিয়ে বিভিন্ন পক্ষের আপেক্ষিক সংস্থান তিনি প্রতিদিন এঁকে রাখেন, তাঁর কথাবার্তায় যুদ্ধের পরিভাষা খইয়ের মতো

ফোটে, সংবাদপত্র নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি কাটান—তারপর রাত্রে ঘুমের মধ্যে রক্তাক্ত ভীষণ স্বপ্ন দেখে এমন সরব ও প্রবল অঙ্গচালনা করেন যে তাঁর সহধর্মিণীকে যুদ্ধের বাস্তবিক স্বাদ যৎকিঞ্চিৎ পেতে হয়। মনোবিজ্ঞানীরা ব'লে থাকেন যে যুদ্ধের কারণ আধুনিক জগতের সর্বজনীন নিউরসিস! সে-কথা ঠিক কিনা জানি না, তবে আমরা বাঙালিরা, যারা প্রায় দুই শতাব্দী ধ'রে একটা অস্ত্র চোখেও দেখি না, খেলার মাঠের মারামারিতে যাদের শৌর্যের চরম পরিচয়, আমরা যে লোমহর্ষণ মহা-সামরিক বর্ণনায় আমাদের স্নায়ুবিকারকেই তৃপ্ত করি, সেটা খুবই সম্ভব মনে হয়। তাছাড়া এ-কথা তো বলাই যায় যে মহাসমরের পরিচালনার ভার যখন কোনোদিক থেকেই আমার উপর ন্যস্ত নয়; তখন অনর্থক তা নিয়ে বাকবিতণ্ডা না-ক'রে চুপচাপ নিজের মনে নিজের কাজ করাই ভালো। সকলের অধিকার ক্ষেত্র এক নয়, যে যার সীমানা মেনে চলবে, এবং নিজের সীমানার মধ্যে অনলস উৎসাহে কাজ ক'রে যাবে—এই সহজ কথাটি মেনে নিলেই অত তর্ক ওঠে না। আমি যদি দেশোদ্ধারব্রতে নামি তাহ'লে দেশের উদ্ধার কিছুই হবে না, সেই সঙ্গে আমিও নষ্ট হবো, কারণ ও-কাজের যোগ্যতা আমার নেই, অন্য-কোনো ক্ষেত্রে সামান্য শক্তি থাকা অসম্ভব নয়। অন্যপক্ষে, বাঙালি কর্মবীর শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন সরকার যদি কবিতা লেখবার চেষ্টা করেন তাহ'লে তাঁর নিজের কিংবা স্বদেশের ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। যে যা পারে না তাতে হাত না-দেয়াই ভালো, যাতে আন্তরিক উৎসাহের কিংবা স্বাভাবিক ধারণাশক্তির অভাব তা নিয়ে একটু শৌখিন নাড়াচাড়া করতে যাওয়া মূঢ়তা। কবি হ'তে হ'লে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে কবিত্ববিকাশেই, কর্মী যিনি কর্মই হবে তাঁর জীবনের অবিরাম সাধনা। এ দুয়ের সংযোগ অসম্ভব বলি না, কিন্তু তাদের মহল আলাদা, কেননা কর্মক্ষেত্রে কবিত্বের উন্মাদনা অসঙ্গত, আবার কর্মের ঘোর কুটিল পন্থার নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব দর্শন বিজ্ঞানের উপাদান হ'তে পারে, সাহিত্যের নয়। কর্মের প্রারম্ভে যেখানে উদ্দীপনার প্রজ্জ্বলন সেখানে কবিপ্রকৃতি সহজেই

সাড়া দিতে পারে, কিন্তু দিনের পর দিন নীরস, কঠিন ও জটিল কর্ম-সাধনার পক্ষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দরকার, কল্পনাপ্রবণ কবিচিত্তের সেটা ক্ষেত্র নয়। অন্যপক্ষে, কর্মে যাঁরা প্রতিভাবান, কিংবা মনে-প্রাণে যাঁরা কর্মী, তাঁরা তাঁদের সমস্ত সময়, সমস্ত উদ্যম ঐ জটিল, কঠিন ও নীরস সাধনাতেই প্রয়োগ করেন, সাহিত্যশিল্পের আলোচনা প্রকৃত অধিকারীর হাতে ছেড়ে দিতে তাঁদের আপত্তি হয় না। কর্মীপুরুষের আকৃতি নিয়ে যাঁরা সাহিত্য বিষয়ে বাকবিতণ্ডা করেন মাত্র, তাঁরা প্রকৃতই কর্মী কিনা সে-বিষয়ে তাই সন্দেহ জাগে, আর সাহিত্যকে কোনো বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্র হিশেবে যাঁরা ব্যবহার করতে চাচ্ছেন তাঁরা যে সাহিত্যিক নন তাঁদের রচনাতেই তার পরিচয়।

চাষা চাষ করবে, কবি কবিতা লিখবে, রাজনীতিক থাকবে রাজনীতি নিয়ে—এর চেয়ে সুখের অবস্থা আর কী হ'তে পারে? সুস্থ স্বাধীন অবস্থায় সাধারণ লোকের রাজনীতি নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত হবার কোনো কারণই নেই, সে-সময়ও হয় না, কারণ নিজের কাজ ও ব্যক্তিগত সুখদুঃখ নিয়েই সবাই ব্যাপৃত। এমন-কোনো সমাজ যদি কখনো জন্ম নেয়, যেখানে সকলেকই স্বাধীন ও সুস্থ, সকলেই নিজের মনের মতো কাজে আনন্দিত ও সে-কাজের উপযুক্ত মূল্যে পুরস্কৃত, সে-সমাজে আজকাল আমরা রাজনীতি বলতে যা বুঝি তা হয়তো থাকবেই না। এই পার্থিব স্বর্গ ভাববিলাসীর অলস স্বপ্ন মাত্র এ-কথা মনে করতে ইচ্ছা করে না, কারণ এ-ই তো প্রতি মানুষের বাঞ্ছিত জীবন, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ ব্যঞ্জনাই তো এ-ই। এ-পর্যন্ত যা হয়নি, ভবিষ্যতেও কখনো তা হবে না তা কেমন ক'রে বলি? এ-পর্যন্তও আমরা দেখেছি যে অপেক্ষাকৃত শান্তির সময়ে সাধারণ লোকের জীবন তার আপন কাজ, তার ছোটো-ছোটো সুখদুঃখই ভ'রে থাকে, কিন্তু স্বাস্থ্য যখন নষ্ট হয়, অশান্তি জেগে ওঠে, দুর্যোগ আসে ঘনিয়ে, তখনই সমগ্র জনসাধারণের মন রাজনীতি গ্রাস ক'রে নেয়, কারণ তখন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে পড়ে আশঙ্কার ছায়া। আজকের দিনে পৃথিবীর

সমস্ত দেশে এমনি একটি দারুণ দুঃসময় উপস্থিত, সমাজের অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব আজ বীভৎসরূপে প্রকট। এ-অবস্থায় শিল্পকলা একটা বিলাস মাত্র, এ-রকম কথা উঠতে পারে। কথাটা বিশেষকিছু নয়, কারণ বাড়িতে কারো গুরুতর অসুখ করলে যেকোনো কবিকেই কিছুদিন কবিতা লেখা বন্ধ রাখতে হয়। তাই ব'লে এটা প্রমাণ হ'লো না যে কবিতা লেখা ব্যাপারটাই তুচ্ছ। তেমনি সর্বব্যাপী মর্মপীড়ার সময়ে শিল্পকলার শুধু নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও হয়তো ব্যাহত হবে, এমনকি, কিছুদিন না-হয় স্থগিতই রইলো, যেমন কোনো-কোনো তরুণ ইংরেজ কবি কলম ফেলে বন্দুক তুলে নিয়ে স্পেনের যুদ্ধে গেলেন, গিয়ে প্রাণও হারালেন। মনে রাখতে হবে তাঁরা রণক্ষেত্রে নেমেছিলেন কবি হিশেবে নয়, মানুষ হিশেবে, তখনকার মতো কাব্যের প্রেরণার চাইতে কর্মের প্রেরণা তাঁদের মনে প্রবল হয়েছিলো। কবি হিশেবে যাঁর কর্তব্য শুধুই ভালো কবিতা লেখা, মানুষ হিসেবে তাঁর অন্যান্য কর্তব্য থাকে। সন্তানের অসুখ করলে আমি যদি সারা রাত জেগে কাটাই তাতে আমার কবিত্বের কিছু পরিচয় নেই, সেটা নিছক সাধারণ মনুষ্যত্ব। অসুখের সময় যেমন কাব্যগ্রন্থের চাইতে ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপশনটারই বেশি দরকার, তেমনি দুর্যোগের দিনে শিল্পকলার চাইতে প্রপাগাণ্ডারই বেশি প্রয়োজন এ-কথাটাও মানা যেতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলবো যে সেটাকে যেন নির্জলা প্রপাগাণ্ডা ব'লেই মানি, সেটাই যুগোপযোগী যথার্থ সাহিত্য এমন ভাণ যেন না করি। রোগের সমস্ত লক্ষণের বর্ণনা দিয়ে পদ্যরচনা করলে রোগও সারবে না, কবিতাও হবে না। রোগশয্যার পাশে ব'সে বিনিদ্র রাত্রিতে হঠাৎ যদি একটি কবিতা লিখেই ফেলি, তখনও আমার চেষ্টা হবে যাতে সেটি ভালো কবিতা হয়, আর তার বিচারও হবে কাব্যেরই আদর্শে, আমার সন্তানের পীড়ার কথা সেখানে উঠবে না। জাগতিক দুঃসময়ের চিন্তা যদি কোনো কবির মনে এমন তীব্রভাবে আঘাত করে যে তিনি কবিতা লেখাই বন্ধ ক'রে দিলেন তাহ'লে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু যদি তিনি কিছু লেখেন, আজ দুর্দিন ব'লে

সে-রচনাকে খাতির করলে চলবে না, দেখতে হবে সেটা শিল্পের আদর্শে উত্তীর্ণ হ'লো কিনা। যিনি কবি তিনি যে যুদ্ধক্ষেত্রে ব'সেও ভালো কবিতাই লিখবেন, তাঁর মনে শিল্পের উৎকর্ষের যে-ধারণা তাকে শিথিল হ'তে দেবেন না তার প্রমাণ অনেক বার পাওয়া গেছে। আমি যদি আমার রচনায় ধনতন্ত্রের কালান্তক মূর্তির বর্ণনা করি তাহ'লেই যেমন লাফিয়ে ওঠবার কিছু নেই, তেমনি যদি প্রিয়ার আঁখির বন্দনা করি তাতেও হতাশ হবার কারণ দেখি না। যে-কোন অবস্থায়, যে-কোন দুরবস্থায়, উভয় বস্তুই কাব্যের বিষয় হ'তে পারে, এবং উভয়ক্ষেত্রেই শুদ্ধু এটুকু বিচার করতে হবে যে রচনাটা যথার্থ সাহিত্য হয়েছে কিনা। শিল্পকলার মূল্য তার নিজেরই মধ্যে, অন্য-কোনো উপলক্ষ্য কি উদ্দেশ্য থেকে ধার করা নয়, এ কথা ভুলে যাওয়া আর মূলগত মূল্যবোধ হারানো একই কথা।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

শিল্পীর, সাহিত্যিকের মূল্য শান্তিনিকেতনে স্বীকৃত এবং সেখানে একটি বিশুদ্ধ শিল্পচর্চার আবহাওয়ায় সময় কেটেছে এ-কথা বলতে গিয়েই এত কথা উঠলো। এ-কথা এতটা জোর দিয়ে বলতে হ'তো না, যদি না দেখতুম বাংলাদেশে সাহিত্যের নামে যা-কিছু চলে তাতে অধ্যাপক; সাংবাদিক, বণিক, আইনজীবী, চাকুরে, ছাত্র, বেকার ইত্যাদি নানারকম জীবই উপস্থিত, অনুপস্থিত শুধু সাহিত্যিক। (বলতেই হয় এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আর ডাক্তাররা এ-পর্যন্ত প্রসংশনীয় সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এসেছেন, কোনো সাহিত্যসম্মিলনের মূল সভাপতি হিশেবে শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়ের নাম যে এ-পর্যন্ত একবারও প্রস্তাবিত হয়নি তাও কম আশ্চর্য নয়।) বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ সমসাময়িক সাহিত্যের সঙ্গে কোনোরকম সংশ্রব রাখেন ব'লে জানা যায় না। বছরে দু'তিনবার ক'রে বহু অর্থব্যয়ে যে-সব সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে, তাতে এক-আধজন সাহিত্যিক যদি উপস্থিত থাকেন সে নেহাৎই দৈবক্রমে। আসলে ওগুলো হয় একদল লোকের আমোদের ক্রীড়াক্ষেত্র, সাহিত্যের সঙ্গে তার সত্যিকার সংযোগ খুবই কম। কিছুদিন আগে কলকাতায় পি. ই. এন. নামে একটি সাহিত্যসংসদ স্থাপিত হয়েছিলো, তাতেও দেখেছি সাহিত্যিকের চাইতে অসাহিত্যিকেরই ভিড়। এ-রকম উদাহরণ অনেক দেয়া যায়। যেখানে গেলে সাহিত্যিক অনুভব করতে পারেন যে এই তাঁর মনের যথার্থ লীলাক্ষেত্র, যেখানে তিনি সম্পূর্ণ আরাম পান, এমন জায়গা এ-দেশে সত্যি খুব কম। এ-বিষয়ে শান্তিনিকেতনের তুলনা নেই।

সমস্ত-কিছু মিলিয়ে শান্তিনিকেতনে এই যে দেখলুম আমাদের

হৃদয়ের বন্ধু-প্রদেশের ছবি, বলাই বাহুল্য তার মূলে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রভাব এখানে কী গভীরভাবে ব্যাপ্ত, 'দৈগন্তিক মরীচিকা'-ঘেরা 'আশ্রমের এই সবুজ জটলা'য় পা দিলেই বোঝা যায়। এখানকার সব মানুষের মধ্যে তাঁর পরিচয়, তাঁরই চরিত্রচিহ্ন সমস্ত আবহাওয়ায়—রীতিনীতিতে, শিষ্টতায়, কথোপকথনে। অবাক হ'য়ে যাই যখন কারো সামান্য কোনো কথায় কি ক্ষুদ্র কোনো ভঙ্গিতে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে রাবীন্দ্রিক আভা, মনে হয় তাঁর ব্যক্তিত্ব-বিকীরণেই ঠিক এমনটি সম্ভব হ'লো। এই শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণে জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য সংগীত চিত্র নৃত্য নাট্যকলার অনুশীলন, মেকলের মেকি বিদ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শিক্ষার এই আনন্দময় আত্মীয়তা, মূঢ়তার ধূসর সাম্রাজ্যে সংস্কৃতির এই উজ্জ্বল উপনিবেশ—এ-সব যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি তা শুধু একটা ঐতিহাসিক তথ্য হ'য়ে নেই, এখানে এলে প্রতি মুহূর্ত আনে তার জীবন্ত অনুভূতি। বিরাট কর্ম-কাণ্ড নিঃশব্দে চলেছে, নানা বিভাগে নানা গুণীর সানন্দ অধ্যবসায়, আর এই সমস্তকে জড়িয়ে, ফুটিয়ে, পূর্ণ ক'রে রয়েছে যে-কবির প্রতিভা তিনি এখন অদৃশ্য ও নিশ্চল। অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে বন্দী হ'য়েও তাঁর দৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত—কোথায় কোন অতিথির সামান্য অসুবিধে হ'লো তাও তাঁর নজর এড়ায় না—নিজে অকর্মক হ'য়েও সমস্ত কর্মের তিনিই প্রেরণা, তিনি প্রচ্ছন্ন কিন্তু তিনিই সব। তাঁরই সম্ভোগ-স্রোত, তাঁরই উচ্ছল জীবনানন্দ ব'য়ে চলেছে উন্মীলিয়মান শিশুচিত্তে, কিশোরজীবনের মধুরিমায়, নাচে, গানে আতিথেয়তায়, ঋতুতে-ঋতুতে উৎসবে অনুষ্ঠানে, মাঝখানে তিনি স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে। সমস্ত আশ্রমটি যেন কবির একটি বিস্তৃত গৃহাঙ্গন. উত্তরায়ণে ঢুকতেই যেমন পাওয়া যায় ফুলের গন্ধের অভিনন্দন, তেমনি তাঁর প্রতিভার সৌরভ হাওয়ায় নিঃশ্বেসিত। আমরা যেমন যে যার পছন্দমতো জিনিশ দিয়ে ঘর সাজাই, তেমনি তিনি তাঁর এই বাড়িটি সাজিয়েছেন, শুধু কতগুলো নিষ্প্রাণ উপকরণে নয়, মানুষিক উপাদানে, প্রাণের বৈচিত্র্যে, গাছপালা ফুল পাখি আকাশের নীলিমায়, দেশের

দুঃসহ অশিক্ষা ও কুশিক্ষার মধ্যে শিক্ষার একটি মহান আদর্শের জীবন্ত প্রয়োগে। এ তো শুধু সাজানো নয়, নিজের মনের মতো পরিবেষ রচনাও শুধু নয়, সাহিত্য সংগীত চিত্রকলার মতো এও তাঁর একটি সৃষ্টি, স্বদেশের, জগতের; উত্তরকালের উদ্দেশে একটি উপঢৌকন।

কবি বলেছেন, 'কর্মজীবনে আমিও নেমেছিলুম একদিন, চেষ্টা করেছি আমাদের দেশের মানুষের দুর্গতি দূর করতে। হয়তো সে আমার অনধিকারচর্চা, হয়তো তাতে সার্থক হইনি, ভালোরকম করতে পারিনি। কী ক'রেই বা পারবো—সারাজীবন চোদ্দ অক্ষর মিলিয়ে এসেছি; ও তো সত্যি আমার কাজ নয়। কিন্তু বেদনা বেজেছে বুকে, চুপ ক'রে থাকতে পারিনি।' এই আশ্রম তাঁর কর্মজীবনের প্রতিভূ হ'য়ে রইলো। তাঁর আদর্শ কতটা সফল হয়েছে, কোথায়-কোথায় এবং কোন-কোন কারণে রয়েছে অসম্পূর্ণতা, সে-আলোচনায় যাবো না, দেখতে হবে তাঁর লক্ষ্যের ব্যাপকতা, তাঁর সাধনার সর্বাঙ্গীণতা। কঠিন ব্রহ্মচর্যের আদর্শ নিয়ে যে-আশ্রমের সূত্রপাত, সেখানে যে প্রাচীন ভারতের অপরিসর তপোবন-ছায়া মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিলো আধুনিক মনুষ্যধর্মের উদার ঐশ্বর্য, এ রবীন্দ্রনাথেরই সাধনার দান। গ'ড়ে উঠলো বৃহৎ বিদ্যালয়; পাশ-করানোর ফুঁকমন্তর-ছোঁয়া শিক্ষার যে-কাঙালিভোজের সঙ্গে ইংরেজ রাজত্বে আমরা পরিচিত তার বদলে শিক্ষা জিনিশটাকে স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ ও আন্তরিক ক'রে তোলবার চেষ্টা চললো। সে-শিক্ষা কোনো জাতিতে ধর্মে বা শুধু পুরুষের মধ্যে আবদ্ধ রইলো না; মেয়েদের তিনি ডাকলেন, ভারতের নানা প্রদেশের ধারা এসে মিললো; স্ত্রী-পুরুষের সহ-শিক্ষা যথার্থ সার্থক হ'লো যৌথ জীবনের উৎসবে অনুষ্ঠানে ক্রীড়ায় কর্মে বনভোজনে। স্থাপিত হ'লো বিশ্বভারতী, বিশ্বমানবের সংস্কৃতির মিলনভূমি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই অনুপম কেন্দ্রটি রচনা ক'রেই, কবি তিনি, তৃপ্ত থাকতে পারতেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভুলতে পারেননি আমাদের দেশের অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্যের নিদারুণ অভাবের কথা, অনুন্নত কৃষি আর ক্ষীণ বানিজ্যের

মর্মান্তিকতা। ক্ষুধিতের কানে শিক্ষার বাণী পৌঁছবে না, তার মানব-মনের দেখা পেতে হ'লে আগে জৈব প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে নেয়া চাই। তাই ফুটলো শ্রীনিকেতন, নগরের উপকণ্ঠে প্রয়োজন মেটানোর কারখানাঘর। ঘন বিজলী-আলোয় ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িতে শ্রীনিকেতনের হাবভাবও যেন উপনাগরিক। সমস্ত মিলিয়ে ছোটো, কিন্তু সুন্দর; বিভিন্ন কারুকর্মের একটি ঘননিবদ্ধ দ্বীপপুঞ্জ। শুনলুম একদল বেরোচ্ছেন বাংলার বিভিন্ন জেলায় রাক্ষসী নিরক্ষরতার সঙ্গে যুঝতে; ওদিকে প'ড়ে আছে চাষের জমি, এখানে তাঁত চলে, ছুতোর খাটে, ঘোরে কুমোরের চাকা, চামড়া রঙিন রূপ নেয়। প্রয়োজন দ্বিগুণ স্বার্থক হয় জাগ্রত রুচির সৌন্দর্যবোধে। বিরাট দুর্গত দেশের দুঃখ নিবারণের কথা ওঠে না, তার জন্যে লাখ-লাখ শ্রীনিকেতন দরকার। দেখতে হবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কত দূর পৌঁচেছে, দেখতে হবে তাঁর জীবনদর্শনের সমগ্রতা। তাঁর সাধনা পরিপূর্ণ জীবনের সাধনা, কখনো ভোলেননি যে সে-জীবনের ভিত্তি মাটিতে, যার বুকে শস্য ফলে, যার তলায় লোহা-কয়লার কারাগার। স্বাধীনতা বলতে তিনি বুঝেছেন নিজের পায়ে দাঁড়ানো, দেশোদ্ধার বলতে বুঝেছেন দেশের অবরুদ্ধ ঐশ্বর্যের মুক্তি—শস্যে, সম্পদে, বানিজ্যে, স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়। তাঁর আত্মশক্তি-মন্ত্রের যে তিনি নিজের হাতে প্রয়োগও করেছিলেন, শ্রীনিকেতন তারই একটি ছবি হ'য়ে রইলো। এই রুক্ষ দেশে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম অতি কঠোর, জলের অভাবে কৃষি দুঃসাধ্য, দুধ-ডিমের চাষ তো চালানোই গেলো না। কৃপালানি একদিন বলছিলেন যে গুরুদেবের এই আশ্রম যদি পূর্ববঙ্গে কি কলকাতার কাছাকাছি গঙ্গার ধারে কোথাও হ'তো তাহ'লে এখানে সোনা ফলতো। এই অনুর্বর জলবিরল ভূমিতে ঢালতে যতটা হয় সে-তুলনায় প্রতিদান পাওয়া যায় অল্পই। রথীবাবু বলছিলেন, 'এখানে কঠিন জীবনসংগ্রামের ভিতর দিয়ে আমাদের দিন কাটে, সেটা ভালোই—ঝিমিয়ে পড়বার সময় নেই।' কিন্তু এই নিষ্ঠার সঙ্গে

প্রকৃতির অকৃপণ সহযোগিতা যদি মিলতো তা'হলে সমস্ত অঞ্চলটি সম্পদে শোভায় ফুটে উঠতো তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া কাছা-কাছি একটি নদী থাকলে দৃশ্যটিও যেন ভ'রে উঠতো, সম্পদের কি উপভোগের কথা ছেড়েই দিলুম।

প্রকৃতির অসহযোগিতা সত্বেও স্বদেশের একটি আত্ম-নির্ভর উজ্জ্বল সর্বাঙ্গীণ ছবি এখানে ফুটেছে। জ্ঞানে কর্মে স্বাধীনতায় সংস্কৃতিতে স্বদেশকে প্রত্যক্ষ করলুম শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন। জানি, ভারতের অন্য এক রূপ আছে, যে-কৃষক নিজে নিরন্ন থেকে আমাদের অন্ন জোগায় এক হিশেবে ভারতবর্ষ বলতে তাকেই বোঝায়। সংখ্যায় সে কোটি-কোটি, সে ক্ষুধিত, সে ব্যাধিজর্জর, সে নিরক্ষর; সে নিঃসীম নিশ্চেতন দারিদ্র্যদুঃখে মগ্ন। তার কথা আমরা কানেই শুনি, চোখে তাকে দেখি না। তাকে আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন গান্ধিজি, তাঁর জীবনে ও ব্যক্তিত্বে। সমগ্র ভারতের প্রতীকরূপে তিনি দাঁড়িয়ে। ফল এই হয়েছে যে অনেকের মনে হেঁটো কাপড় প'রে আধ-পেটা খেয়ে থাকাটাই মহাত্মার মহিমায় প্রতিফলিত হ'য়ে একটা আদর্শে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু দুর্গতি তো উপাস্য নয়, দুর্গতি আমাদের শত্রু, তাকে বিনাশ করাই জীবন-সাধনা। কবে এই অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো ফুটবে, মানুষ জেগে উঠবে আশায়, শক্তিতে, আনন্দে, আমরা আছি সেই শুভ প্রত্যুষের প্রতীক্ষায়। তখন ভারত বলতে নগ্ন চাষি আর বোঝাবে না, নতুন উল্লসিত প্রতীক মানুষের মনে-মনে সৃজিত হবে। তা কবে হবে কে জানে, এখনকার মতো আমরা শান্তিনিকেতনে আসবো ভারতের ঐশ্বর্য দেখতে। আমাদের এই আনন্দময় মাতৃভূমি রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি, তাঁরই কাব্যে ও জীবনে ঘটেছে ভারতের পুনরুজ্জীবন, তিনিই আমাদের স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি।

রবীন্দ্রনাথ

গীতময় ইন্দ্রধনু

কঠিন রোগসংকটের ছায়ায়, দেশব্যাপী জয়ধ্বনির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আশি বছর পুরলো। শুনেছিলুম তাঁর রোগযন্ত্রণার, তাঁর ইন্দ্রিয়বিকলতার কথা ; মনে ভয় ছিলো, কেমন না জানি তাঁকে দেখবো। হয়তো দু'একটির বেশি কথা বলবেন না, হয়তো আগেকার মতো নিঃসংশয় নিঃসংকোচে তাঁর পাশে গিয়ে বসা চলবে না। দেখে ভুল ভাঙলো। প্রথম দিন সন্ধ্যায় তাঁকে দেখলুম বাইরের বারান্দায়, মনে হ'লো ক্লান্ত, রাত্রির আসন্ন ছায়ায় ভালো ক'রে যেন দেখতে পেলুম না। পরের দিন সকালে যখন তাঁর কাছে গেলুম, তিনি ব'সে ছিলেন দক্ষিণের ঢাকা বারান্দায়। পরনে হলদে কাপড়, গায়ে শাদা জামা। পাশে একটি থালায় বেলফুলের স্তূপ। মুখ তাঁর শীর্ণ, আগুনের মতো গায়ের রং ফিকে হয়েছে, কিন্তু হাতের মুঠি কি কব্জির দিকে তাকালে বিরাট বলিষ্ঠ দেহের আভাস এখনো পাওয়া যায়। কেশরের মতো যে-কেশগুচ্ছ তাঁর ঘাড় বেয়ে নামতো তা ছেঁটে ফেলা হয়েছে, কিন্তু মাথার মাঝখান দিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত কুঞ্চিত শুভ্র দীর্ঘ কেশের সৌন্দর্য এখনো অম্লান। মনে হ'লো তাঁর চোখের সেই মর্মভেদী তীক্ষ্ণ ভাবটা আর নেই, তিনি যখন কারো দিকে তাকান সে-চাহনি স্নিগ্ধকোমল। এইজন্যে তাঁকে মোগল বাদশাহের মতো আর লাগে না, বরং অশীতিপর টলস্টয়ের ছবির সঙ্গে কোথায় যেন মেলে। এই অপরূপ রূপবান পুরুষের দিকে এখন স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেমন ক'রে আমরা শিল্পীর গড়া কোনো মূর্তি দেখি। এত সুন্দর বুঝি রবীন্দ্রনাথও আগে কখনো ছিলেন না, এর জন্যে এই বয়সের ভার আর রোগদুঃখ-ভোগের দরকার ছিলো। বর্নার্ড শ একবার এলেন টেরির জন্মদিনে একটি পদ্য লেখেন, তার বলবার কথাটা ছিলো এইরকম যে এ কী আশ্চর্য কাণ্ড

যে প্রতি বছরে আমাদের বয়েস বাড়ে আর এলেনের বয়েসে কমে! বয়স যত বেড়েছে রবীন্দ্রনাথ ততই সুন্দর হয়েছেন এ-কথা তাঁর বিভিন্ন বয়সের ছবি ধারাবাহিকভাবে দেখলেই বোঝা যাবে। কিছুদিন আগেও তাঁর মুখে তীব্র একটি উজ্জ্বলতা ছিলো, চোখ যেন ধাঁধিঁয়ে যেতো, বিরাট সভার মধ্যেও অন্য প্রত্যেকটি মুখ মুহূর্তে যেতো ম্লানিয়ে। সে-ও সুন্দর, কিন্তু আজ তাঁর শীর্ণ মুখে যে সন্ধ্যারাগের কমনীয়তা দেখা দিয়েছে, দৃষ্টিতে ফুটেছে যে-সকরুণ আভা, সৌন্দর্যের এই বোধ হয় চরম পরিণতি।

কে বলবে তাঁকে দেখে যে তাঁর অসুখ! আমরা যাওয়ামাত্রই আরম্ভ হ'লো তাঁর কথা। কণ্ঠস্বর ঈষৎ ক্ষীণ, মাঝে-মাঝে একটু থামেন, কিন্তু কথার জন্য কক্ষনো হাৎড়াতে হয় না, ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি আপনিই মুখে এসে বসে। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন, মাঝে-মাঝে আড়চোখে শ্রোতাদের দেখে নেন, কথার স্রোত তাতে বাধা পায় না। সেদিন এক ঘণ্টার উপরে প্রায় অনর্গল কথা বললেন, সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা জীবনদর্শন হাস্যপরিহাস মেশানো এক আশ্চর্য অবিশ্বাস্য ঝরনায় নেয়ে উঠলুম। এঁর অসুখ! ভাবা যায় না। এই প্রদীপ্ত মনীষা, জীবনের ছোটো-বড়ো সমস্ত ব্যাপারে এই জ্বলন্ত উৎসাহ, ভাষার উপর এই রাজকীয় কর্তৃত্ব—এর সঙ্গে কোনোরকম রোগ কি বৈকল্যকে সংশ্লিষ্ট করতে আমাদের মন একেবারেই বিমুখ হয়। অথচ সত্যি তিনি অসুস্থ, অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁর রোগে যন্ত্রণা যেমন, ছোটোখাটো বিরক্তিকর আনুষঙ্গিকও কম নয়। সাধারণ লোকের—এমনকি অনেক অসাধারণ লোকেরও—মেজাজ খারাপ হ'তো, আচরণে দেখা দিতো শৈথিল্য, বাইরের জগৎ থেকে স'রে এসে মনটা ক্রমশই নিবিষ্ট হ'তো রোগের চিন্তায়—দাঁত-ব্যথা হ'লে দাঁতের কথা ছাড়া আর-কিছু ভাবা যায় না এ তো কথাই আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপের এতটুকু বিকৃতি কোথাও হয়নি। তাঁর মুখে সব কথাই আছে, রোগের কথা একটিও নেই। এমন কি 'অসুস্থ' কি 'রুগ্ন' এ-সব কথা পর্যন্ত তিনি মুখে আনেন না। 'বড়ো ক্লান্ত আছি,' 'শরীরটা মজবুত নেই,' 'দেহযন্ত্র বিকল

হয়েছে'—বড়ো জোর এইটুকু বলেন। যেন তাঁর বিশেষ-কিছুই হয়নি। এতটুকু শৈথিল্য নেই আচরণে কি চিন্তায় কি ব্যবহারে। তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচর্যা করবার অধিকার মাত্র দু'তিনজনেরই আছে। তাঁদের উপর খুব বেশি চাপ পড়ে ব'লে নতুন দু'একজন ভর্তি করার চেষ্টা চলে, কিন্তু নতুন লোকের হাতে শুশ্রূষা নিতে তাঁর প্রবল অনিচ্ছা। বাধ্য হ'য়ে এখন তাঁকে পরের সেবার উপর নির্ভর করতে হয়, সেটা সহ্য না-ক'রে উপায় নেই ব'লেই করেন, কিন্তু তার পরিমণ্ডল যথাসম্ভব সংকীর্ণ রাখতে চান। বোধ হয় সেবিত হ'তেই তাঁর ভালো লাগে না, রুচিতে বাধে। এক প্রৌঢ় অধ্যাপক বলছিলেন যে তিরিশ বছর তিনি শান্তিনিকেতনে আছেন, তার মধ্যে মাত্র দু'বার গুরুদেবকে রাগতে দেখেছেন। একবার রেগেছিলেন তাঁর খাবার থালায় ময়লা ছিলো ব'লে—আর-একবার একটি শিক্ষক বাড়ির দাওয়ায় ব'সে দু'জন ছাত্রকে দিয়ে গা টেপাচ্ছিলেন, এ-দৃশ্য হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের চোখে প'ড়ে যায়। 'তাঁর অমন রাগ আমরা কখনো দেখিনি।' নিজের সম্বন্ধে, এই দীর্ঘ দুর্মর রোগের মধ্যেও তাঁর এই রুচিবোধ ও সৌন্দর্যজ্ঞান যে তেমনি জাগ্রত তার নানা গল্প এবার শুনলুম। এমনকি যন্ত্রণা যখন দুঃসহ, চারদিকে আশঙ্কার ছায়া, তখনও কৌতুক করবার সুযোগ পেলে তিনি ছাড়েন না। রোগী হিশেবে তিনি শান্ত, কিন্তু খুব বেশি বাধ্য হয়তো নন। কিছুতেই শুতে চান না, জোর ক'রে শুইয়ে দেয়া হয়। ঘুমুতে বলা হয়, শুয়ে-শুয়ে চোখ বুজে পা নাড়েন। বলা হয়, এবার ঘুমুতে হবে, তখন শরীরটাকে নিশ্চল ক'রে বলেন, 'বেশ, তাহ'লে আমি শুয়ে-শুয়ে এখন ভাবি তোমরা আর-সব পারো, আমার ভাবনা তো থামাতে পারো না।' চিকিৎসা শুশ্রূষা শরীরকে সাহায্য করে রোগের সঙ্গে যুঝতে, কিন্তু রোগ যেখানে মনকে আক্রমণ করতে উদ্যত, সেখানে বাইরে থেকে শক্তি জোগানো যায় না, আর সেখানে রবীন্দ্রনাথ জিতে যাচ্ছেন নিজের জোরেই।

তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনে যখন বেরিয়ে আসতুম, রোজই নতুন ক'রে মনে হ'তো যে সমস্ত জীবন ধন্য হ'য়ে গেলো। তাঁর কথা যেন

বর্ণাঢ্য গীতিনিঃস্বন, যেন গীতধ্বনিত ইন্দ্রধনু। তা যেমন শ্রুতিসুখকর তেমনি মনোবিমোহন। বাংলা ভাষার উপর তাঁর প্রভুত্ব যে কী অসীম তা তাঁর কথা না-শুনলে ঠিক ধারণা করা যায় না। তিনি হুবহু তাঁর শেষের দিককার গদ্য বইগুলোর মতো কথা বলেন, অতি সাধারণ কথাকেও অসাধারণ ক'রে বলবার ক্ষমতায় তাঁর গল্পের সকল পাত্রপাত্রীকে তিনি হার মানান, উপমা রূপক থেকে-থেকে ফুটে উঠেছে ফুলের মতো, হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে ঝিলকিয়ে উঠেছে কৌতুক। তাঁর নিটোল সুন্দর স্বর্ণঝংকৃত কণ্ঠস্বর আর তাঁর উচ্চারণের স্পষ্ট, দৃঢ় অথচ ললিত ভঙ্গির সঙ্গে সকলেই তো পরিচিত, তাঁর মুখে শুনলে বাংলাকে অনেক বেশি জোরালো ও মধুর ভাষা ব'লে মনে হয়। তাঁর অভ্যর্থনার মধুরতা ও আলাপের আন্তরিকতা ভোলবার নয়। অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে থাকতুম পাছে বেশিক্ষণ থাকা হ'য়ে যায়, পাছে তাঁর কাজের কি বিশ্রামের ক্ষতি করি। তিনি একটু থামলেই মনে হ'তো এখন বোধ হয় ওঠা উচিত। কিন্তু তিনি একটার পর একটা নতুন প্রসঙ্গ পাড়তেন—এখানে অনেকেই বললেন যে এত কথা আর এত ভালো কথা কবি অনেকদিন বলেননি। তাঁর একটি মহৎ গুণ এই যে যখন যাকে কাছে ডাকেন তার প্রতি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেন, কারো উপস্থিতিতে উন্মনা কি উদাসীন ভাব তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। হয়তো অনেক সময় দু'চার মিনিটেই কথা শেষ করেন, কিন্তু সেই অল্প সময়েই একটি সরস পরিপূর্ণতার স্বাদ আসে —তিনি যে মস্ত একটা কাজের লোক, তাঁর সময় যে মহামূল্য এ ভাবটা তাঁর মধ্যে কখনোই ফোটে না। অন্নদাশঙ্কর এক জায়গায় লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কাছে যখনই যাওয়া যায় তখনই মনে হয় তাঁর অফুরন্ত সময়, কোনো কাজই তাঁর নেই। খুব সত্য এ-কথা। ব্যস্ততার ভাব তাঁর মধ্যে একেবারেই নেই, তাড়াহুড়োর ক্ষ্যাপামি কখনো তাঁকে ছোঁয় না; অন্তহীন কাজ নিয়ে অন্তহীন ছুটির মধ্যে তিনি ব'সে আছেন। যখনই যার সঙ্গে কথা বলেন মনে হয় ঠিক ঐ লোকটির সঙ্গে কথা বলা ছাড়া আর-কোনো কাজই তাঁর নেই। তাঁর তুলনায়

অতি সামান্য ও অতি তুচ্ছ কাজ যাঁরা করেন তাঁরাও ব্যস্ততার ঠেলায় নিজেরাও হাঁপিয়ে ওঠেন অন্যেরও হাঁপ ধরান ; যে-রকম শুনি তাতে বোঝা যায় যে ইওরোপের ক্ষুদ্র লেখকদেরও সাক্ষাৎ পেতে হ'লে বিস্তর হাঙ্গামা পোয়াতে হয়—এদিকে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে রয়েছে একটি অকুণ্ঠিত মুক্তি, তাঁর দুয়ার সব সময়েই খোলা। নানা দেশ থেকে নানা লোক আসে তাঁকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, পারতপক্ষে কাউকেই প্রত্যাখ্যান করেন না ; তাঁর উপর ছোটো-বড়ো কত যে দাবী তার অন্ত নেই, সাধ্যমতো সবই পূরণ করেন। সেদিন পর্যন্তও নিজের হাতে সব চিঠির জবাব দিয়েছেন, এমনকি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠিয়েছেন তাও নিজের হাতে নকল ক'রে। এত কাজের সঙ্গে এত অবকাশকে তিনি কেমন ক'রে মেলাতে পারলেন এ একটা আশ্চর্য রহস্য হ'য়ে রইলো।

আমরা যখন গিয়েছিলুম রবীন্দ্রনাথ থাকতেন 'উদয়নে'র একতলায় দক্ষিণ দিকের ঘরগুলিতে। অসুখের পরে তিনি একটু গ্রীষ্মকাতর হ'য়ে পড়েছেন, তাই তাঁর শোবার ঘরে ঠাণ্ডাই যন্ত্র বসানো হয়েছে। ঘরটি বৃহৎ নয়। এক দিকে দেয়াল-লগ্ন লম্বা টেবিলে সারে-সারে ওষুধ পথ্য শিশি বোতল গেলাশ। আর আছে একটি খাট, একটি ইজিচেয়ার, ছোটো বুক-কেসে কিছু বই, আর অভ্যাগতদের বসবার জন্য কয়েকটি চামড়া-আঁটা মোড়া। দেয়ালে তাঁর নিজের আঁকা খান দুই, আর চীনে চিত্রী জুপিয়ঁর একটি ঘোড়ার ছবি, তাছাড়া একখানা জাপানি মেঘের দৃশ্য। পাশে আর একটি ঘর, সেটি আরো ছোটো। সমস্ত পৃথিবী, পৃথিবীর সব পর্বত প্রান্তর সমুদ্র নদী নগর, সমস্ত সঙ্গ ও নির্জনতা আজ কবিজীবনে এসে মিলেছে ঐ দুটি ছোটো ঘরে আর দু'দিকের বারান্দায়।

হে নূতন !

রবীন্দ্র-জীবনের এই অধ্যায়টি মহাকাব্যের উপাদান। মনে করা যাক দিগ্বিজয়ী একজন রাজা, ঐশ্বর্যের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতায় যাঁর জীবন কেটেছে, একদিন ভাগ্যের কুটিলতায় তাঁকে রিক্ত হ'তে হ'লো। রাজত্ব রইলো, রইলো অন্তরের রাজকীয়তা, কিন্তু যে-সব পথ দিয়ে রাজার সঙ্গে রাজত্বের যোগাযোগ সে-গুলি বন্ধ হ'য়ে গেলো। সব রইলো, অথচ কিছুই রইলো না। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-প্রেরণা অক্ষুণ্ণ, অক্লান্ত তাঁর প্রতিভার উদ্যম, কিন্তু দেহের যে-সামান্য কয়েকটা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া শিল্পরূপ প্রকাশিত হ'তে পারে না, তারা ঘোষণা করেছে অসহযোগ। যে-কবি বলেছিলেন, 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি' যোগাসন সে নহে আমার', তাঁর ইন্দ্রিয়ের দরজাগুলো একে-একে রুদ্ধ হ'য়ে আসছে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, চোখের সঙ্গে বই লাগিয়ে অতি কষ্টে পড়তে হয়, তবু পড়েন। শ্রবণ-শক্তি নিস্তেজ, আঙুল দুর্বল, তুলি ধরবার জোর নেই, কলমও কেঁপে যায়। তিনি নাকি বলেন, 'বিধাতা মুক্তহস্তেই দিয়েছিলেন, এবার একে-একে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। ভেবেছিলুম শেষ জীবন ছবি এঁকে কাটাবো, তাও হ'লো না।' তাঁর মানসলোকে ছবিরা ভিড় ক'রে আসে, ওদের রঙে রেখায় ফোটানো হয় না, ফিরে যায় তারা প্রেতলোকে। মন জ্বলন্ত, হাত চলে না। ক্ষণে ক্ষণে প্রাণে লাগে সুর, কণ্ঠে জাগে না—ছবির মতোই শূন্যে হারিয়ে যাচ্ছে গীতস্রোত। নানা শিল্পকর্মের মধ্যে তাঁর সব চেয়ে প্রিয় যে গান তার পালা বুঝি ফুরুলো। যেদিন বৃষ্টি নামলো সন্ধেবেলায় গিয়েছিলুম কবির কাছে। রথীবাবুর বড়ো বসবার ঘরটিতে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের গানের অনেকগুলি রেকর্ড বাইরে প'ড়ে আছে—কবি খানিক আগে শুনছিলেন। তিনি ছিলেন ভিতরের দিকের ছোটো

ঘরটিতে, খুব ক্লান্ত ছিলেন সেদিন। আমরা যেতে বললেন, 'একটা বর্ষার গান evoke করবার চেষ্টা করছিলুম—এখন আর হয় না।' শান্তিনিকেতনে বর্ষা এসে কবির অভিনন্দন পেলো না এমন ঘটনা এই প্রথম।

আর তাঁর জীবনের চির সঙ্গী—তাঁর লেখা? ষোলো বছর থেকে গদ্যে পদ্যে নানা রূপে নানা বিষয়ে কোটি-কোটি কথা যিনি লিখে আসছেন তিনি এখন কলম ধরতে পারেন না, নামটা সই করতে কষ্ট হয়। তবু রচনার বিরাম নেই; 'জন্মদিনে' পর্যন্ত নিজের হাতেই লিখেছেন, আজকাল মুখে-মুখে ব'লে যান, সে-কথা সহজে পছন্দ হয় না, বার-বার অদল-বদল করেন, তবু সংশয় থেকে যায় ঠিক কথাটি ঠিকমতো বুঝি বলা হ'লো না। আজকাল তাই নিজের রচনা সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত বিনয়। শরীর যত বড়োই শত্রুতা করুক, রচনায় কোনোরকম অপরিচ্ছন্নতা তিনি সইতে পারেন না; ছোটোদের নাম ক'রে গদ্যে পদ্যে 'গল্পসল্প' লিখছেন, তাও হয়েছে নিখুঁত শিল্পকর্ম। রবীন্দ্রনাথের বইয়ের সমালোচনায় একটা সুর আজকাল প্রায়ই ধরা পড়ে—'বুড়ো হয়েছেন, শরীর ভালো নেই, কী আর লিখবেন—যা লিখছেন এই ঢের!' এই পিঠ-চাপড়ানো ভাবটায় তাঁর রচনার প্রতি শুধু নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিও ঘোর অবিচার করা হয়। আজকাল কোনো লেখাই বোধ হয় তাঁকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না, সমালোচকদের কথা তাই অগ্রাহ্য করেন না, বরং শুনতে চান। শুনতে চান কিন্তু খাতির চান না, আধ-মনা আন্দাজি প্রশংসা চান না, তিনি জানতে চান রচনাটি হয়েছে কিনা। এখানেই তাঁর বিনয়। তিনি তো মনে করতে পারতেন, 'রবীন্দ্রনাথ যা লিখবে দেশের লোক তা-ই নেবে, কাজ কী আমার অন্যের কথায় কান দিয়ে!' কিন্তু আজকের দিনেও নিজের প্রতিষ্ঠাকে তিনি গৃহীত ও অনশ্বর সত্য ব'লে ধরেন না, প্রতিটি নতুন রচনার পিছনে থাকে নতুন লেখকের উৎসাহ; প্রতি বারেই তাঁর নতুন জন্ম ব'লে প্রতি বারেই তাঁর নতুন প্রতিষ্ঠার দাবি। 'হে নূতন, দেখা দিক আর বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ'—তাঁর এই নবতম বাণী শুধু কথার কথা নয়, ওতে আছে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের মূল

সত্য।

সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে এই যে 'আমার যা হবার হ'য়ে গেছে' এ-ভাবটি কখনো তাঁর মনে এলো না। এ-জন্যেই এত লিখেও তিনি পুরোনো হলেন না, এত দিনেও তিনি ফুরিয়ে গেলেন না। তাঁর লেখা—রবীন্দ্রনাথের লেখা ব'লে নয়—যে-কোনো লোকের লেখা হিশেবেই দেশের লোকের মনে লেগেছে কিনা সে-বিষয়ে এখনো তিনি অনুসন্ধানী। পাঠকদের তিনি বলেন—আর কিছু দেখো না, কে লিখেছে, তার বয়েস কত, উপজীবিকা কী, সে কোন সমাজের লোক ও-সব ভুলে যাও, লেখাটা দ্যাখো। ও-সব দেখে লেখাটা যদি ভালো লাগে সে-ভালো-লাগাটাই খাঁটি। কোনো লেখা কারো ভালো লেগেছে শুনলে তিনি খুশিও হন, যদি সে-ভালোবলা নেহাৎই খুশি করবার জন্যে না হয়। কথার মারপ্যাঁচে তাঁকে ফাঁকি দেয়া অসম্ভব, আন্তরিক অনুভূতির যেখানে অভাব তিনি চট ক'রে ধ'রে ফেলেন। সে-অভাব সমালোচকরা প্রায়ই পূরণ করবার চেষ্টা করেন ঘোরতর যুক্তিতর্ক দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ জানেন কতটুকু তার মূল্য। ভালো লেগেছে এই কথাটি ঠিকমতো বলতে পারাই তাঁর মতে যথার্থ সমালোচনা, এর বেশি আর-কোনো কথা নেই। কিন্তু ঠিকমতো বলা শক্ত। বোকার মতো বললে হবে না। তার জন্যে চাই শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, শিল্পবোধ। সেটা পাণ্ডিত্য নয়, সেটা অনুভূতিরই শিক্ষা, আলোচ্য শিল্পে প্রত্যক্ষ গভীর অভিজ্ঞতা। তারই জোরে ভালো লেগেছে কথাটা বলবার মতো হয়, শোনবার মতো হয়। এ-কথাটা যেখানে ভালো ক'রে বলা হয় সেখানেই তাঁর মন নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারে, সমালোচনার অন্যান্য পদ্ধতিতে তাঁর আস্থা নেই। তাঁর সাহিত্য কি ছবির আলো-চনায় চুল-চেরা বিশ্লেষণ তিনি চান না, ঐতিহাসিক সামাজিক পটভূমিকার বর্ণনাও চান না, নিছক স্তুতির শূন্যতা তাঁকে পীড়িত করে, তিনি শুধু খোঁজেন বিশুদ্ধ উপভোগের প্রাণবান পরিচয়। যদি তিনি দাম্ভিক হতেন তাহ'লে তাঁর মনোভাব এ-রকম হ'তো না।

কিন্তু তিনি জানেন ভালো লাগানোটা কত কঠিন কাজ, তার চেয়ে বড়ো কীর্তি শিল্পীর কিছুই নেই, আর শিল্পের শেষ যাচাই সেখানেই। আমাদের বলেছিলেন বিদেশিরা তাঁর ছবি কী ভাবে নিয়েছে। বর্মিংহামে গিয়েছিলেন, সেখানে ওরা বললে, 'এ-ছবি আমাদের নয়; তুমি প্যারিসে যাও, ওরা ঠিক ধরতে পারবে।' প্যারিসে সবাই বললে, 'আমরা এতদিন ধ'রে যা করবার চেষ্টা করছি তুমি যে তা-ই করেছো!' ভালেরির সঙ্গে ছবি দেখতে এসেছিলেন ফরাশিদেশের সব চেয়ে বড়ো আর্ট-ক্রিটিক। 'তিনি আমাকে জড়িয়ে ধ'রে, চুমু খেয়ে, বললেন, "তুমি যে কত বড়ো আমরা তা জানতুম, কিন্তু তুমি যে সত্যি এতই বড়ো তা জানতুম না।" তারপর গেলুম মস্কৌতে, সেখানে সবাই বললে —"এ কী! এ ছবি তুমি কোথায় পেলে? এ যে সব সোভিয়েট ছবি।" বিদেশে সর্বত্রই তাঁর ছবির আশ্চর্য সমাদর হয়েছে, সব চেয়ে বেশি জর্মানিতে। বার্লিনে ওরা ওদের ন্যাশনাল গ্যালারির জন্য সমস্ত দেশের তরফ থেকে তাঁর কয়েকটি ছবি কিনে রেখেছিলো, এ-সম্মান আর-কোনো জীবিত চিত্রকরকে ওরা দেয়নি। সেবারে ইওরোপে পৌঁছিয়ে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী হয় প্যারিসে; আসলে তিনি প্যারিসে গিয়েছিলেন বর্মিংহাম যাবার পরে নয়, আগে, আর বর্মিংহামের আর্ট-ক্রিটিকরা তাঁকে বার্লিনে যেতে বলেন, প্যারিসে নয়। আমাদের কাছে বলবার সময় তিনি বিস্মৃতিবসে দুটো ঘটনা মিশিয়ে ফেলেছিলেন। বার্লিনের কথা তিনি উল্লেখই করেননি, অথচ আমরা তো জানি যে সমস্ত জর্মানি যে-ভাবে কবি-বরণ করেছিলো ইতিহাসে তার তুলনা নেই। সেই জর্মানির এ-অবস্থাও তাঁকে দেখে যেতে হলো।

বিশ্বের বৃত তিনি, কিন্তু তাঁর বিশ্বব্যাপী যশ তাঁর মনে মোহ আনেনি। তিনি জানেন কবির প্রকৃত আসন তাঁর স্বদেশ, যদি সে-দেশ মূঢ়ের দেশ হয়, তবুও।

'ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে

ধরা পড়ুক তার রহস্য, মূঢ়ের দেশে নয়,
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদী,
আছে ইংরেজ জর্মান ফরাসী।'

এ-কথা পরোক্ষে তাঁর নিজেরই কথা। স্বদেশের কথা, স্বজাতির কথা উঠলে তাঁর মুখ দিয়ে যে-সব কথা বেরোয় তা যেন হঠাৎ জাগা অগ্নিগিরির বিস্ফোরণ ; এই ঈর্ষা-কাতর ক্ষুদ্রস্বার্থমগ্ন আত্মবিভক্ত বাঙালি জাতি নিয়ে তীব্র বেদনাবোধ তাঁর মনে চাপা আগুনের মতো জ্বলছে। অথচ সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালির কৃতিত্বের কথা বলতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। ইংরেজ এ-দেশে এলো যে-নবীন সংস্কৃতির বাহন হ'য়ে তার সংঘাতে এত বড়ো ভারতবর্ষের মধ্যে এক বাংলাদেশেই এলো সাহিত্যবন্যা, তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ বলেন, বাংলাদেশে ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিলো, 'ইংরেজের বদলে ফরাশি হ'লো আমরা সবাই মোপাসাঁ হ'য়ে উঠতুম।' অর্থাৎ, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় বলতে গেলে, এটা ইংরেজের জন্যে হয়েছে, কিন্তু ইংরেজের জন্যেই হয়নি। এ-নবজীবন আমাদের মধ্যে আসতোই, ইংরেজ উপলক্ষ্য মাত্র। পাশ্চাত্ত্য প্রেরণা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অন্যান্য জিনিশ জাগিয়েছে—কোথাও আইন কোথাও গণিত কোথাও বাণিজ্য; কিন্তু সাহিত্য ফুটলো শুধু বাংলাদেশেই। এ-কথা যে কত সত্য তা বুঝতে পারি যখন দেখি যে অন্যান্য প্রদেশের অগ্রসর সমাজে মাতৃ-ভাষা সম্বন্ধে কোনো প্রীতি নেই, ধনী ও উচ্চশিক্ষিত কোনো-কোনো পরিবারে মাতৃভাষা ব্যবহৃত পর্যন্ত হ্য় না, পড়াশুনো আলাপ-আলোচনা সবই ইংরেজীতে। অবাংলা ভারতে কেউ-কেউ আজকাল সাহিত্যের দিকে ঝুঁকেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা অনেকেই ইংরেজিতে লেখেন ; আর ভারতের রাষ্ট্রভাষা ইংরেজিই হওয়া উচিত এমন মত অনেকেরই শোনা যায়। বাঙালির কলঙ্কের অন্ত নেই, আমরা হীন, পরশ্রীকাতর, অতি অভদ্র, আমাদের মধ্যে যদি কিছু ভালো থাকে তা মাতৃভাষার প্রতি আমাদের মমত্ববোধ, যা এতদিনে, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সাধনার ফলে, আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। আজ এ-কথা বলা যায় যে বাঙালির

মতো এত গভীরভাবে তার মাতৃভাষাকে আর-কোনো ভারতীয় ভালো-বাসে না, এই আমাদের একমাত্র গর্বের কথা। পরভাষায় লেখক হবার প্রচেষ্টা যে মৃত্যুদণ্ড নিয়েই জন্মায়, তা আমরা বুঝেছি মধুসূদনের সময়েই. আর এখন, রবীন্দ্রনাথের পরে ও প্রভাবে, বাংলাকে সত্যি আমরা প্রাণের ভাষা, মনের ভাষা ক'রে নিয়েছি, সাধারণ লোকের মধ্যেও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা যায়। অন্তত এই বিষয়ে বাঙালি আজ জীবন্ত ও আত্মসম্মানী। নিজের ভাষার উপর যার দরদ নেই তার জাতীয়তা-বোধের, তার স্বাদেশিকতার মূল্য কোথায়। মনে হয় হিন্দি ও উর্দুভাষী নবীন যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এ-বিষয়ে সচেতনতা এসেছে; সম্প্রতি এই দুই ভাষার ও সাহিত্য কিছু প্রাণের পরিচয় যে পাওয়া যাচ্ছে, এটা খুব সুখের কথা। এই উজ্জীবনের ঢেউ ক্রমে ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে যদি পড়ে, মাতৃভাষা সম্বন্ধে ভালোবাসা সকলের মনেই যদি জাগে, তাহ'লে একদিক থেকে সেটাই হবে আমাদের বৃহৎ একটা মুক্তি। এখনই দেখা যাচ্ছে গুজরাট মহারাষ্ট্রে মাতৃভাষার চর্চা বাড়ছে। মনে হয় দক্ষিণ ভারতে ইংরেজি ভাষার মোহ এখনো প্রবল, উত্তর ভারতেরও কোনো-কোনো লেখক ইংরেজির শৃঙ্খলেই আবদ্ধ, এ-বিষয়ে মুক্তি পেয়েছে শুধু বাংলাদেশ। মধুসূদন একবার বলেছিলেন যে সংস্কৃতের বন্ধন থেকে বাংলা ভাষাকে মুক্ত হ'তে হবে, তাঁর সময়ে সে-কথা ছিলো সত্য; আজ আমাদের লক্ষ্য ইংরেজির নাগপাশ থেকে বাংলার মুক্তিসাধন।

কেউ হয়তো বলবেন, কোনো ভারতীয় জোসেফ কনরাড কি জন্মাতে পারেন না? সেটা অসম্ভব নয়, আর এ-প্রসঙ্গে তো শ্রীঅরবিন্দেরই উল্লেখ করা যায়। কিন্তু দেখা যাবে যে কেউ যখন পরভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হন সেটা তাঁর পক্ষে পরভাষা আর থাকে না, ঘটনা-চক্রে সেটাই হ'য়ে যায় তাঁর মাতৃভাষা। শ্রীঅরবিন্দ বাংলা বলতে গেলে জানেনই না, যোগ-সাধন ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ে তিনি যে শতকরা-একশোই ইংরেজ তাঁর রচনা পড়লে সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। দৈবক্রমে কারো জীবনে যদি এ-রকম ঘ'টে যায় তাতে এটাই

প্রমান হয় যে যার যেটা মাতৃভাষা তার পক্ষে সেটাই আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন ; চেষ্টা ক'রে বহু যত্নে অভ্যেস ক'রে যে-ভাষা শিখি তাতে সংবাদপত্রের প্রবন্ধ লেখা যায়, কংগ্রেসে অ্যাসেম্‌ব্লিতে বক্তৃতা করা যায়, সামাজিক আলাপ-প্রলাপও চলে, কিন্তু প্রাণের কথা তাতে বলা যায় না। সত্যি যদি আমার কিছু বলবার থাকে, যা কোনো সংবাদ নয়, তথ্য নয়, তত্ত্ব নয়, যা একটি বাণী, সে-কথা মাতৃভাষায় ছাড়া বলতেই পারবো না। পরভাষা আপন ক'রে নেবার ক্ষমতা প্রতিভারও নেই, সেটা শুধুই কতগুলো অ-সাধারণ ঘটনার উপর নির্ভর করে—যেমন কেউ যদি বিদেশেই জন্মায় ও বিদেশিদের মধ্যেই বড়ো হয়, কিম্বা বড়ো হ'য়েও কেউ যদি স্বজাতিসঙ্গহীন হ'য়ে বিদেশি সমাজেই বাকি জীবন কাটায়—আর এইজন্যেই এর উদাহরণ সর্বদাই অতি বিরল। শ্রীঅরবিন্দ বিলেতে যতখানি ইংরেজভাবে মানুষ হয়েছিলেন কিপলিং সাহেবও যদি ভারতে ততখানি ভারতীয়ভাবে মানুষ হতেন তাহ'লে তিনি হয়তো সব চেয়ে বড়ো উর্দু লেখক হ'য়ে হতভাগ্য ভারতভূমিকে ধন্য করতেন।

মাতৃভাষাকে আমরা যে আপন ক'রে নিতে পেরেছি এটা বাঙালির একটা কীর্তি বলবো, কারণ এ-বিষয়ে নিজের অন্তরে ছাড়া আর কোথাও কোনো উৎসাহ ছিলো না, এখনো খুব বেশি নেই। পৃথিবীর কোনো দেশে যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনা, সেই রকম একটি দানব আমাদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে—আমাদের শিক্ষার বাহন পরভাষা। এর মর্মান্তিক কুফল এখন আমরা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি। আমাদের সাংসারিক ও ব্যবহারিক জীবনে ইংরেজি এখনো মস্ত জায়গা জুড়ে আছে : ইংরেজি ছাড়া চাকরি হয় না, ব্যবসা চলে না, পলিটিক্স থেমে থাকে। সব ক্ষেত্রে না হোক, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনও এখন পর্যন্ত মানতে হয়। কিন্তু এর ফলে আমাদের জীবনে একটা অদ্ভুত অসঙ্গতি লিপ্ত হ'য়ে আছে, উঠতে-বসতে সেটা খোঁচা দেয়। আমরা ভয়ে-ভয়ে ইংরেজি শিখি, ভালোবেসে শিখি না, তাই ইংরেজির সঙ্গে প্রাণের যোগাযোগ আমাদের ক্ষীণ। আমাদের ইংরেজি শিক্ষা হলো পেটের দায়ে, জ্ঞান-

আহরণ কি সাহিত্য-উপভোগের উদ্দেশ্যে নয়, তাই এ-শিক্ষা আমাদের পুষ্ট করে না, নষ্ট করে। ইংরেজি যা শিখি তা ব'লে কাজ নেই, অথচ ঐ ভাষাটা নিরন্তর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক বোধটা দেয় নষ্ট ক'রে। এ যে কত বড়ো সর্বনাশ আমরা লেখকরা তা জানি। বাংলায় লিখতে ব'সে দেখি ইংরেজিতে ভাবছি, অথচ ইংরেজিতেও যে কথাটা পুরোপুরি বলতে পারি তা নয়। বাংলা লেখা আমাদের শিখতে হয় অতি কষ্টে প্রাণপণ পরিশ্রমে। অবশ্য বিনা চেষ্টায় বলতে শিখি ব'লেই যে মাতৃভাষা আমার হ'য়ে গেলো তা নয়, ওকে আয়ত্ত করতে হ'লে সব দেশেই কঠিন সাধনার প্রয়োজন। ভাষাকে শিল্পরূপে গ'ড়ে তোলা এমনিতেই শক্ত কাজ, আমাদের দেশে তার উপর বিদেশি ভাষার মধ্যবর্তিতা জড়িত হ'য়ে ব্যাপারটিকে আরো দুরূহ ক'রে তোলে। অন্যান্য দেশে ইস্কুল-কলেজের লেখাপড়া হয়তো কিছু সাহায্য করে, আমাদের দেশে করে প্রতিকূলতা। বাংলা লেখা শিখতে হ'লে সে-শিক্ষা বরং ভুলতেই হয়। ছেলেবেলা থেকে আমাদের সমস্ত শিক্ষা ইংরেজিতে হয় ব'লেই এখন পর্যন্ত আমাদের সাধারণ শিক্ষিত লোকদের বেশির ভাগই, ভালো বাংলা দূরে থাক, নির্ভুল বাংলাও লিখতে পারেন না—ছাপার অক্ষরের বইয়েও শুধু অপটুতা নয়, প্রমাদও লক্ষিত হয় প্রচুর। বাংলা লিখতে ভাবতে হয়, এমনকি কষ্ট হয়, ইংরেজি খুব কম সময়ে হু-হু ক'রে লেখা যায় এ-কথা অনেকেই বলবেন। তার কারণ ইংরেজিতে কতগুলো বাঁধা গৎ আছে, বাংলায় প্রতিটি কথা জোগাতে হয় নিজের মন থেকে। এদিকে চোদ্দ বছর ইংরেজি ভাষা অভ্যাস করবার পর বাঙালির কলম থেকে যে-ইংরেজি বেরোয় তা অতি অকথ্য ভাষা, তা না ইংরেজি না বাংলা, তাকে বাংরেজি বললেই ঠিক হয়। বাংলা ভাষা আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে, এ-কথা ঠিক, কিন্তু আমাদের বিড়ম্বনার এখনো অন্ত নেই। ইস্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষাই এখনো সব চেয়ে প্রধান হ'য়ে আছে অথচ প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি আমরা কিছুই শিখি না, কিন্তু আংরেজিক অভ্যাসদোষে মাতৃভাষা ভুলি—শিক্ষার নামে

এমন প্রবঞ্চনা কেউ কি কখনো ভাবতে পেরেছিলো? তিনটে চারটে পাশ ক'রে অন্যান্য বিষয়ে আমাদের অতল অজ্ঞতার কথা ছেড়েই দিলুম— কোনো জ্ঞান, কোনো বিদ্যাই যে আমাদের মর্মে পৌঁছয় না, রক্তে মেশে না, গলায় আটকে থেকে কষ্ট দেয়, যতক্ষণ না পরীক্ষার হলে উদগীরণ ক'রে দিয়ে সুস্থ হই, তার নানা কারণের মধ্যে পরভাষার মধ্যস্থতার কথা সকলের আগে বলতে হয়। আমাদের মতো অতি সহিষ্ণু জাতির পক্ষেও এ-অবস্থা, অসহ্য হ'য়ে উঠেছে, তাই সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষার বাংলাই হয়েছে বাহন, সাধারণভাবেও দেশে মাতৃ-ভাষার চর্চা বাড়ছে। যে-মানসিক রুগ্নতায় আমরা ভুগলাম আমাদের সন্তানেরা তা থেকে অনেকটা মুক্ত হবে আশা করা যায়।

কবি প্রকাশিত তাঁর মাতৃভাষায়, তাঁর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রও তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বদেশ, তাঁর ভাষায় যারা কথা বলে তাদের মধ্যে। অসীম যশস্বী হ'য়েও অসীম বিনয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আজ জানতে চান তাঁর নিজের দেশকে সত্যি তিনি কিছু দিতে পেরেছেন কিনা। বাংলাদেশ যিনি সৃষ্টি করলেন তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে বাংলাদেশ তাঁকে নিয়েছে কিনা। তিনি যে ব্যর্থ হননি এই কথাটি শুনে যেতে চান। তাঁর এবারের জন্মদিনে যত অভিনন্দন তাঁর উপর বর্ষিত হ'লো তাতে তিনি এইটুকু দেখতে পেলেন যে সমস্ত দেশ তাঁকে গ্রহণ করেছে। 'তোমরা দুয়ো দাওনি আমাকে—আমাদের দেশে তা-ই দেয়।'

ছবি ও গান

তাঁর মুখে শুনলুম তাঁর ছবির কথা। লেখা কাটাকুটি করতেন, তাই থেকে ফুটলো ছবি। এলোমেলো কাটাকুটিগুলো হঠাৎ একদিন রূপ নিতে চাইলো। 'ওরা claim করতো, ওদের প্রেতলোকে ফেলে রাখতে পারতুম না। প'ড়ে থাকতো লেখা, ওদের রূপে ফলাতুম।' 'Claim' কথাটি এখানে বড়ো সুন্দর। এতে বোঝা যায় ছবি আঁকাটা তাঁর একটা আকস্মিক আজগুবি শখ বা ক্ষণিক রঙিন কবিখেয়াল মাত্র নয়, ভিতরের দিক থেকেই এর প্রচণ্ড তাগিদ ছিলো। শোনা যায় আঁকতে শুরু করার অনেক আগে থেকেই তিনি মাঝে-মাঝে বলতেন, 'সবই ক'রে দেখলুম, ছবিটা শুধু আঁকা হ'লো না।' মনের সঞ্চিত ইচ্ছার প্রথম ভীরু উঁকি-ঝুঁকি দেখা দিলো কবিতার কাটাকুটিতে। তারপর একবার যখন লজ্জা ভাঙলো, ডাকলো রেখারঙের বান। তাঁর চিত্রীজীবন ক'বছরেরই বা, এদিকে ছবির সংখ্যা দু' হাজার। ছবির জগতে প্রথম যখন ঢুকলেন, সে কী আশ্চর্য আবিষ্কার। নতুন ক'রে যেন চোখ ফুটলো, দেখঁতে শিখলেন। দেখলেন জগতে দর্শনীয়ের অফুরন্ত মিছিল। 'এতদিন শুধু কবি ছিলুম—বসন্ত এসেছে, শুনেছি তার পাখির গান, পাতার মর্মর, মনে দোলা দিয়েছে দক্ষিণের হাওয়া, আজ দেখি গাছের পাতার ফাঁকে-ফাঁকে কত সব মুখ উঁকি দিয়ে রয়েছে। কোনোদিকে তাকাতে পারিনে—যেখানে চোখ পড়ে সেই-খানেই এমন কিছু-দেখি আগে যা কখনো দেখিনি।' তাঁর ছবি নিয়ে বা সাধারণভাবে চিত্রকলা নিয়ে, আমাদের দেশে যে-সব আলোচনা হয় তা তিনি ঠিক গ্রহণ করতে পারেন না। তার বেশির ভাগই তাঁর কাছে ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। 'ছবিটা দ্যাখো, দেখতে

শেখো—আর কিছু না। ছবিটা ছবিই, তার বেশি কিছু নয়, তার কমও না। চেয়ে ছাখো, ছবিটা ছবি হয়েছে কিনা।' কিন্তু, তিনি বলেন, দেখবার দৃষ্টি নেই আমাদের। তার জন্যে চাই বহুদিনের অভ্যাস। আমরা আমাদের দেশে অল্প কিছু খুচরো ছবি মাত্র দেখতে পাই, আর দেখি বিদেশি ছাপা ছবি। ও-সব যে কী তার কোনো ধারণাই হয় না মূল ছবি না দেখলে। ইওরোপে গিয়ে তিনি স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখেছেন সত্যিকার ছবি, সত্যিকার মূর্তি, কী আশ্চর্য সেই শিল্পপ্রতিভা! তার স্বাদ আমরা পাইনি, ছবি সম্বন্ধে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কাব্য আমাদের অনেকদিনের, তার সম্বন্ধে একটা সহজ ধারণাশক্তি আমাদের হয়েছে। কিন্তু ছবি আমাদের দেশ পায়নি, সর্বসাধারণের মধ্যে এখনো স্থান হয়নি তার, ছবি আমরা দেখতেই জানিনে তো তার সমালোচনা করবো কী।

আঙ্গিকের কথা তুললে তিনি কানই পাতেন না। হাত নেড়ে বলেন, 'ও আমি কিছু জানিনে, ও আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। কেমন ক'রে হ'লো আমি জানিনে, হ'য়ে যদি থাকে তো হয়েছে।' ছবি আঁকায় কোনো বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা তিনি কখনো পাননি এ তো সবাই জানেন। বিদেশে নানা ছবি দেখেছেন, স্বদেশে দেখেছেন অবনীন্দ্র গগনেন্দ্র নন্দলালকে ছবি আঁকতে—ছবি সম্বন্ধে এই তো তাঁর শিক্ষা। তিনি বলেন গান সম্বন্ধেও তা-ই, ছেলেবেলা থেকে গান অনেক শুনেছেন, শেখার মতো ক'রে শেখেননি কখনো। 'বিষ্ণু ওস্তাদের খুব শখ ছিলো আমাকে গান শেখাবেন, কিন্তু আমি তাঁকে ফাঁকি দিয়েই বেড়িয়েছি। যে সুর লেগেছে আমার গানে তা আমি আমার নিজের ভিতর থেকেই পেয়েছি, কোন-কোন রাস্তা ধ'রে কেমন ক'রে তা আমার মধ্যে এলো তা আমি নিজেই জানিনে। দিনুকে যখন আমি গান শেখাতুম তিনি হঠাৎ হয়তো ব'লে উঠতেন, এইখানে কোমল নিখাদ লেগেছে। আমি অবাক হ'য়ে বলতুম, তা-ই নাকি? ছবি আর গান এ দুই আমার অবচেতন মন থেকে উৎসারিত।' আর-একদিন

বলছিলেন ছন্দের কথা। যে-কোনো শিল্পরচনায় ছন্দোবোধ হ'লো আসল। তালে পাকা না হ'লে গান হ'তে পারে না এই তাঁর মত। এটা দেখেছেন যে একটা জিনিশ তাঁর মধ্যে একেবারে মজ্জাগত—সে হ'লো ছন্দ, রিদ্‌ম্। জীবনে যা-কিছু করেছেন ছন্দ থেকে কখনো ভ্রষ্ট হন নি, হ'তে পারেন নি। কি গানের সুরে, কি ছবির রূপে, এই মৌল ছন্দোবোধেই ছিলো তাঁর নির্ভর।

শুধু ছবি আর গান কেন, কোনো বিষয়েই তো নির্দিষ্ট নিয়ম-মাফিক শিক্ষা তিনি নিতে পারেননি—সেটা তাঁর প্রকৃতিতেই নেই। তিনি চিরকালের ইস্কুল-পালিয়ে। এ-কথা তিনি নিজে এত বেশি ক'রে রাষ্ট্র করেছেন যে আমাদের দেশে অনেকের এমনকি অনেক জ্ঞানীজনেরও— এ-রকম ধারণা দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য দৈব প্রতিভার জোরেই এতখানি হয়েছেন, কোনো বিষয়েই যথার্থ শিক্ষা তাঁর নেই। 'রবীন্দ্রনাথ ছবি বোঝেন না, গান বোঝেন না', ও-সব বিষয়ে পাণ্ডিত্যের দাবি যাঁরা করেন তাঁদের ও-কথা বলতে বাধে না; 'রবীন্দ্রনাথ অশিক্ষিত', এ-কথাও, ঈষৎ হালকা সুরে হ'লেও, কখনো কোনো প্রাজ্ঞজনকে বলতে শোনা যায়। এখানে বলতে হয় যে কুশিক্ষার চাইতে অশিক্ষা ভালো এবং আমরা যে সকলেই কুশিক্ষিত তাতে সন্দেহ কী। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'গান আমি কিছুই বুঝিনে', সে-কথা যদি কেউ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন তাতে তাঁর বোধশক্তির ক্ষীণতা ছাড়া আর-কিছু প্রমাণ হয় না। আমরা অল্প জানি ব'লেই সে-জানাটুকু যখন-তখন যেমন-তেমন জাহির করবার চেষ্টায় সর্বদাই টগবগ ছটফট করি, তাকে বাড়িয়ে ফাঁপিয়ে ফেনিয়ে ফুলিয়ে মনোবিপণীর বাতায়ন আমরা প্রাণপণে সাজাই—যাতে দেখামাত্র চমক লাগে। পাছে কেউ মনে করে লোকটা মূর্খ, সেজন্য আমাদের মুখে ও লেখায় বইয়ের নাম, লেখকের নাম, উদ্ধৃতিবচনের ছড়াছড়ি, নিজের শ্রেষ্ঠতাপ্রমাণের ইচ্ছায় আমরা এতই কাতর যে তর্কের কোনো ছুতো পেলে জোঁকের মতো আঁকড়ে থাকি। আমরা যে কত কুশিক্ষিত এতে তারই প্রমাণ হয়। বই আমরা

পড়ি, হজম করতে পারিনে ; ভশভশ ক'রে ফেনিয়ে ওঠে আস্ত খাদ্যকণা, হয়তো ঈষৎ দুর্গন্ধও ছড়ায়। আমাদের দেশের এই ফুটনোট-কণ্টকিত ভীষণদর্শন পাণ্ডিত্যকে রবীন্দ্রনাথ যথাযোগ্য ভয়ের চোখেই ছাখেন : কি ধনের কি জ্ঞানের কি শক্তির অধিকার যেখানেই নিদারুণ গাম্ভীর্যের দম্ভে প্রকাশিত, সেখানেই তাঁর অভ্রভেদী অবজ্ঞা, উচ্চহাসির মুক্ত হাওয়ায় সে-গাম্ভীর্যকে তিনি ছারখার ক'রে দিয়েছেন তাঁর গল্প নাট্য ব্যঙ্গরচনার পাতায়-পাতায়। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থকীট, গ্রন্থবিলাসী কিংবা গ্রন্থদাম্ভিক নন, তিনি গ্রন্থভুক। খেতে পারেন, খেয়ে হজমও হয়। তাঁর প্রতিভার কথাই যদি ওঠে তবে এ-কথাও বলতে হয় যে শিক্ষিত হবার প্রতিভাও তাঁর অলৌকিক। কোনো বিষয়ই কালেজি ধরনে পড়বার তাঁর দরকার করে না, বুকে হেঁটে আস্তে-আস্তে তিনি এগোবেন কেন, তিনি যে ইঙ্গিতের হাওয়ায় উড়ে যেতে পারেন জ্ঞানের শেষ সীমায়। তিনি শিখেছেন হয়তো কম, কিন্তু জেনেছেন সব। তাই তাঁর রচিত কোনো প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. আর. এস. কি পি.-এইচ. ডি. খেতাবের জন্য যদিও মনোনীত হবার কথা নয়, তবু তার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে এমন অনেক কথা যা থেকে যে-কোনো একটি বেছে নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে ফেনাতে পারলে ডিগ্রিলাভ ঘটতে পারে ডক্টরেটের থীসস রবীন্দ্রনাথ লিখতে পারতেন না এ-কথা মানতেই হয়— কেমন ক'রেই বা পারবেন, তিনি যা-কিছু লেখেন তা-ই যে থীসসের উপকরণ হ'য়ে ওঠে। অসামান্য তাঁর শোষণশক্তি, যা-কিছু পড়েন শোনেন ছাখেন তার সারাংশ সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে রক্তে গিয়ে মে বাকিটা ঝ'রে যায় বিস্মৃতিলোকে। তাই বিদ্যা তাঁর বোঝা নয়, বি তাঁর সত্তাপ্রাণ ; তিনি তা বহন করেন না, তাঁকে তা লালন করে জ্ঞানের চরম তাঁর দখলে, তাই তিনি নিস্তরঙ্গ। তাঁর পড়াশুনো অসী না জানেন এমন বিষয় নেই, কিন্তু তাঁর কথাবার্তায় কখনো তা প্রকা পায় না। এমন-কিছু বলেন না যা তাঁর আপন অনুভূতি আপ উপলব্ধির কথা নয়। এত বিষয়ে কথা বলেন, কখনো তাঁর মুখে শোনা

যায় না কোনো গ্রন্থের কি লেখকের নাম ; দৃষ্টান্তছলেও অন্যের কথা বলেন না, যা-কিছু বলেন সব তাঁর নিজের কথা, যে-কোনো প্রসঙ্গ-পথে চলতে-চলতে ডাইনে বাঁয়ে স্বতই ফুটে ওঠে উদাহরণ, জ্ব'লে ওঠে বোধি। এত লিখেছেন, তার মধ্যে উপনিষদ, মহাভারত আর বৈষ্ণব কবিতা বাদ দিয়ে অন্য গ্রন্থের উল্লেখ কি উদ্ধৃতি বলতে গেলে নেই-ই। পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করেন, তিনি উদ্ঘাটন করেন যে-কোনো বিষয়ের মর্মরহস্য ; সমালোচক করেন ঘর্মাক্ত বিশ্লেষণ, তাঁর একটি কথায় হঠাৎ চারদিক আলো হ'য়ে ওঠে। যামিনী রায় যখন ছবি সম্বন্ধে কথা বলেন সে-কথা এলোমেলো হয়, হয়তো স্পষ্ট ক'রে মনের কথা বলতে পারেন না, কিন্তু এটাই সব চেয়ে ভালো লাগে যে চিত্রকলার কোনো পরিভাষা তিনি একবারও ব্যবহার করেন না, নিতান্ত সাধারণ ঘরোয়া ভাষার বাইরে কোনো ভাষা যে তিনি জানেন তা-ই মনে হয় না। এতে এটা বোঝা যায় যে ছবির বিদ্যেটা সত্যিই তাঁর দখলে। অতি দুরূহ, তাই অতি বিরল, এই সহজ স্বাচ্ছন্দ্য, এবং যে-কোনো বিষয়ে এই স্বাচ্ছন্দ্য রবীন্দ্রনাথের, তার উপর আছে তাঁর ভাষার অপরূপ দীপ্তি ও শক্তি। তিনি এমন ভাষায় এমন ভঙ্গিতে কথা বলেন যেন তিনি বিষয়টার কিছু জানেন না, যেন ও-বিষয়ে তিনি নিজে কি পৃথিবীর অন্য কেউ এর আগে কিছু ভাবেননি কি বলেননি, যেন আদিম অজ্ঞতা নিয়ে জিনিশটাকে তিনি এই প্রথম দেখছেন। এইজন্যে তাঁর দেখাটা এত স্বচ্ছ, বলাটা এত সহজ। এককালে তিনিও মূঢ়তার মাথায় হাতুড়ি পিটিয়েছেন, বুঝিয়েছেন, যুক্তি এঁটেছেন, তর্কে নেমেছেন ; কিন্তু আজ তিনি যেখানে এসে পৌঁচেছেন সেখান থেকে যুক্তি-তর্কের জটিল মধ্যবর্তী সিঁড়িগুলি একবারেই পার হ'য়ে সোজাসুজি সত্যকে তিনি দেখতে পান—সে নিরাবরণ, সে নিঃসংশয়। প্রসঙ্গ যত জটিলই হোক, মুহূর্তে চলে যান তার মূলে ; তাঁর কথায় তাই সেই সরলতা, জ্ঞানের যা শেষ ফল। আমরা যারা নানা অসম্বদ্ধ পঠনখণ্ডের দূষিত চক্রে দিশেহারা হ'য়ে ঘুরি, সব-শেষের পড়া বইটির উদ্গীরণ নিজের মতামত ব'লে চালাতে লজ্জা

পাইনে, রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে আমরা এটুকু অন্তত শিখতে পারি যে শিক্ষিত হওয়া কাকে বলে।

নানা বিষয়েই কথা বলেন, কিন্তু সাহিত্যের চেয়ে—বাংলা সাহিত্যের চেয়ে—প্রিয় তাঁর কিছুই নয়। নতুন কে কী লিখছে, হাস্যরসের রচনা দেখা দিচ্ছে কিনা, ভালো নাটক হচ্ছে না কেন, এ-সব বিষয়ে আগ্রহ দেখলুম একটুও কমেনি। যত বই আর পত্রিকা তাঁর কাছে আসে সব তাঁর হাতে দিতে হয়, তাঁর পড়বার যোগ্য নয় ব'লে সরিয়ে ফেলা চলবে না। এখন হয়তো অনেককিছুই অপঠিত থাকে, সেটা ইচ্ছার অভাবে নয়, দেহের বৈরিতায়। তাঁর নামের চিঠি খোলবার অধিকার অন্য-কারো ছিলোই না এতদিন, আজকাল তাঁর সামনে সব চিঠি খোলা হয় ও প'ড়ে শোনানো হয়। একটি স্কুলের ছেলে জানতে চেয়েছে অমুক নাচওয়ালি সম্বন্ধে তাঁর মত কী, সে-চিঠিও বাদ যায় না। উত্তর দেবার মতো হ'লে তক্ষুনি জবাব যায়। এ-সব ছোটোখাটো নানা ব্যাপারে এইটেই দেখলুম যে রোগে বিধ্বস্ত হ'য়েও তিনি পরিপূর্ণভাবে বেঁচে আছেন, জীবনে কোনোখানেই ছন্দপতন হ'তে দেননি।

জীবনসম্রাট

আমরা যখন গেলুম তখন একটি নতুন ছোটো গল্প তিনি সদ্য শেষ করেছেন। আরো অনেক নতুন ও নতুন ধরনের ছোটো গল্প তাঁর কাছ থেকে আমরা পেতে পারতুম—যদি কোনো উপায়ে ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গেই রচনা হ'য়ে যেতো। 'যোগাযোগে'র দ্বিতীয় পর্ব সম্পূর্ণ ভাবা আছে, আমাদের বললেন সেই গল্প, রোমাঞ্চিত হ'য়ে শুনলুম। এই আশ্চর্য গল্প মানসলোকের সীমানা পেরোবে না, অসম্পূর্ণ রইলো 'যোগাযোগে'র মতো মহৎ উপন্যাস। বড়ো লেখায় হাত দেবার উপায় নাই, ছোটোদের জন্য ছড়া বাঁধেন, গল্প গাঁথেন, কখনো কবিতা কখনো সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন—হঠাৎ হয়তো একটি ছোটো গল্প বেরিয়ে যায়, কি রুদ্র তেজে জ্ব'লে ওঠে রণদীর্ণ উন্মত্ত সভ্যতার প্রতি নিদারুণ অভিশাপ—এইভাবে যেটুকু পারেন তৃপ্ত রাখেন মহান আকাঙ্ক্ষা, অক্লান্ত শক্তি। রোগদুঃখের চাইতে ঢের বেশি নিষ্ঠুর এই যন্ত্রণা, শরীর-মনের এই দ্বন্দ্ব। এদিক থেকে তাঁর জীবন এখন উৎপীড়িত, কল্পনার সঙ্গে কর্মের, চিন্তার সঙ্গে ব্যঞ্জনার বিরোধে অসহনীয়। অন্তত তা-ই হওয়া উচিত। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না। বরং তাঁর মধ্যে দেখা যায় প্রশান্তির পূর্ণতার ছবি। বধির বেঠোফেনের প্রলয়-বিক্ষোভ তাঁর নেই। তিনি আত্ম-সমাহিত, কিন্তু উদাসীন নন। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের দিকে তাঁর চোখ খোলা, অন্যায়ের ক্ষণিক স্পর্ধাও সইতে পারেন না, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সবই যেন মেনে নিয়েছেন। আক্ষেপ নেই। নালিশ করেন না। নিজের অক্ষমতার কথা যখন বলেন তাতে হয় ঈষৎ কৌতুকের, নয় একটি করুণ কোমলতার সুর লাগে। বিরাট বিক্ষোভ মনে যদি থাকে তো মনেই আছে। আর-কেউ তার খবর জানে না।

অথচ বেঠোফেনের বধিরতার চাইতে রবীন্দ্রনাথের এই বন্দী-জীবন ট্র্যাজিডি হিশেবে কম নয়। দেখতে তিনি ভালোবাসেন। সেবারে আমাদের বলেছিলেন, 'এখন আমি আর-কিছুই করি না, শুধু দেখি।' শান্তিনিকেতনের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরের দুপুরে ঘরে-ঘরে যখন দরজা বন্ধ, তিনি কতদিন বারান্দায় ব'সে কাটিয়েছেন দিগন্ত-ছোঁয়া মাঠের মধ্যে দৃষ্টি মেলে'। রাত কেটে গিয়ে যখন ভোর হয়, সেই সঙ্গম-সময়টিকে প্রতিদিন দেখেছেন, ডুবেছেন বর্ষার অন্ধকার, মজেছেন জ্যোছনায়। আর আজ একটি অন্ধকার ঠাণ্ডা-করা ঘরে তিনি বন্দী, হঠাৎ ঘুম থেকে চমকে উঠে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হয়—'এখন দিন না রাত?' জ্যোছনা আজ ছায়ার মতো, মেঘ অদৃশ্য। তাঁর জগতে দিনরাত্রির বৈচিত্র্য আর নেই, ঋতুর লীলা ফুরিয়েছে। আশ্রমের পাখিরা ভোরবেলা ডাকাডাকি করে, তিনি শোনেন না; বৃষ্টি পড়ে, তাঁর জগতের নীরবতা ভাঙে না। বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর কাছে পৌঁছয় ক্ষীণ আভাসে, অস্ফুট ইঙ্গিতে, আর কল্পনায়। অসাধারণ তাঁর বৈচিত্র্যপ্রিয়তা; এক জায়গায় বেশিদিন মন টেঁকে না, কিছুদিন পর-পরই বাড়ি-বদলের ঝোঁক চাপে, তাছাড়া আছে অবিশ্রাম দেশভ্রমণ। আর এখন একই বাড়ির মধ্যে ঘর বদল করাও দুঃসাধ্য, ভ্রমণের কথা তো ওঠেই না। ব'সে-বসে হয়তো ভাবেন দেশ-বিদেশের নদী নগর পর্বত প্রান্তরের কথা; বিশেষ ক'রে পদ্মার কথা মনে পড়ে, হয়তো ইচ্ছে করে ফিরে যেতে। 'তোমরা পদ্মাপারের মানুষ—আর দেখলে তো এখানকার কোপাই! কী রুক্ষ দেশ—একেবারে রাজপুতনা। পদ্মা থেকে কোন সুদূরে চলে এসেছি।' হঠাৎ হয়তো মনে হয় সমুদ্রের ধারে গেলে সেরে উঠবেন। কিন্তু কত দূরে পদ্মা, আরো কত দূরে সমুদ্র। বেশ, এই ঘরের মধ্যেই তাঁর বৈচিত্র্যসাধন। চেয়ারটি এক-একদিন এক-এক দিকে ঘুরিয়ে বসেন, ঘরের অন্যান্য জিনিশ সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে, পর-পর দু'দিন দেখলুম না ঘরের একরকম ব্যবস্থা। এতেও প্রমাণ হয়, রবীন্দ্রনাথ যত বড়ো শিল্পী, তত বড়োই জীবনশিল্পী। তাঁর সমগ্র জীবন শুধু নয়, তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপনও একটি নিখুঁত

শিল্পকর্ম। শান্তিনিকেতনে এলে বোঝা যায় জীবনের কত বড়ো একটি কল্পনাকে তিনি বাস্তব ক'রে তুলেছেন, এখানে তাঁর জীবন রাজার মতো, খুব বড়ো অর্থে রাজারমতো। ডি. এইচ. লরেন্স যে আক্ষেপ করেছিলেন—

'Give me, oh, give me
My kingdom, my power, my glory,
Not the daily bread alone.'

তাঁর এই আক্ষেপের নিবৃত্তি হ'তো, জীবনসম্রাটের যথার্থ মূর্তি তিনি দেখতে পেতেন শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথকে দেখলে।

রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, নানারকম অদ্ভুত স্বপ্ন দ্যাখেন, স্বপ্নের মধ্যে কথাও বলেন। রাত দুটোয় জেগে উঠে আর ঘুম নেই। তখন শুরু হয় গল্প, কি কোনো রচনা মুখে-মুখে ব'লে যান। একদিন ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। এ-বিষয়ে তাঁর মুখে কিছু শুনবো এর বেশি আশা ছিলো না। পরদিন সকালে যেতেই বললেন, 'কী কতগুলো বর-ঠকানো প্রশ্ন করেছো! এই নাও।' হাতে দিলেন রানি চন্দর হস্তলিখিত প্রবন্ধ; তাঁর ঘুম ভাঙবার পর শুরু করেছিলেম, আমাদের ঘুম ভাঙবার আগে শেষ হ'য়ে গেছে। দু'দিন পরে মনে হ'লো ওটা যথেষ্ট হয়নি, সঙ্গে জুড়ে দিলেন আর-একটি ছোটো প্রবন্ধ। রচনা বিষয়ে কোনো অসম্ভব অনুরোধ জানালেও 'না' শুনতে হয় না, একটু হেসে বলেন, 'আচ্ছা, ভেবে দেখবো।' কোনো প্রশ্নেই তিনি নিরুত্তর নন, কোন প্রসঙ্গেই অনিচ্ছুক নন। তিতি সর্বদাই প্রস্তুত; একদিকে যেমন তাঁকে ঘিরে আছে অফুরন্ত ছুটি, তেমনি আবার তাঁর মনের কারখানা-ঘরে ছুটির লাল তারিখ কখনো ছিলো না, এখনো নেই।

অন্যদিকে তাঁর হৃদয়বৃত্তির মধুরতাও লোভনীয়। তাঁর স্নেহশীলতার, সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে অটুট মনোযোগের কথা এখানে সকলের মুখে-মুখে। আহার ব্যাপারে অরুচি কি উদাসীনতা তাঁর

কোনোদিনই নেই, আর অন্যকে খাওয়াতে নিজের গল্পের নায়িকাদের মতোই তাঁর ব্যাকুলতা। নিজের আহার নিয়ে যদিও স্বাদে-বিস্বাদে নানারকম পরীক্ষাই তিনি করেছেন, ভোজনতত্ত্বের সে-সব রহস্যে অতিথিকে দীক্ষা দেবার চেষ্টা করেন না, তাঁর গৃহের 'lyric feasts'-এর কথা বাংলাদেশে গল্প হ'য়ে থাকবে। এখন তিনি নিজে আর খেতে পারেন না, কিন্তু খাওয়াবার উৎসাহ কমেনি। নিজে অচল ব'লে সব সময় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে থাকেন, তাঁর চোখের আড়ালে কারুরই যে খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে এটা তাঁকে বিশ্বাস করানোই শক্ত। তাঁর নানা কর্মের ভার নিয়ে তাঁর সঙ্গে যাঁরা থাকেন কি ভ্রমণ করেন, পাছে কোনো সময়ে তাঁদের খাওয়ার কোনোরকম অসুবিধে হয়, এ-দুশ্চিন্তা তাঁর কায়েমি। শুনলুম বাড়িতে কোনো অতিথি এলেই রবীন্দ্রনাথের মা-র কথা তাঁর মনে প'ড়ে যায়—তাঁরও অতিথিবৎসলতা ছিলো অসামান্য। আতিথেয়তার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুঁৎখুঁতে, কিছুতেই ঠিক তাঁর মনের মতোটি হয় না; নিয়তকুশলকারী তাঁর পরিজনবর্গ, কিংবা অতিথিরা স্বয়ং, অনেক ক'রে বললেও তাঁর মনে এ-সন্দেহ থেকেই যায় যে অতিথির যত্নে বুঝি কোনো ত্রুটি হচ্ছে। আমরা ঠিক সময়ে চা পাচ্ছি কিনা, রাত্রে আলো পাচ্ছি কিনা, পাখার অভাবে হয়তো কষ্ট হচ্ছে—এ-সব বিষয়ে প্রায়ই খোঁজ নিতেন, আর আমাদের উত্তরগুলো যে নেহাৎ ভদ্রতাপ্রসূত নয়, সত্যি যে আমরা খুব সুখে আছি এ-বিষয়ে কখনোই তাঁকে তৃপ্ত করতে পেরেছি ব'লে মনে হয় না। একদিন সকালে উত্তরায়ণে চা খাচ্ছি, একটু পরেই কবির কাছে যাবো, সুধাকান্তবাবু আমাদের বললেন, শুধু খেলে হবে না, 'কী-কী খেলেন তা তাঁকে গিয়ে বলতে হবে—বুঝলেন?' আমরাও কবির কাছে গিয়ে এক-এক ক'রে সবগুলো জিনিশের নাম আউড়িয়ে গেলুম—খেয়ে খুশি হয়েছি এ-কথা শুনে তিনি কত খুশি। রতন কুঠিতে সাপের রব যখন উঠলো তিনি ভাবলেন আমরা খুবই ভয় পেয়েছি। বিকেলের দিকে সুধাকান্ত-বাবুকে ডেকে বললেন, 'উদীচীর উপর-তলাটা পরিষ্কার ক'রে দিতে

বলো—ওদের সেখানে নিয়ে এসো।' সুধাকান্তবাবু বললেন, 'এখন সব লোকজন চ'লে গিয়েছে, ও বড্ড অসুবিধে।' কবি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'সে তো ঠিকই। লোকজন ডাকবে, ঘর সাফ করবে, জিনিশপত্র সরাবে—সে তো খুবই অসুবিধে। এদিকে ওরা হয়তো সারা রাত জেগে ব'সে থাকবে—সেটাও অসুবিধে। কোনটা বড়ো অসুবিধে ভেবে দেখো।'

এ-কথা সুধাকান্তবাবুর মুখেই পরের দিন শুনেছিলুম। কথাটা শুনে যেমন লজ্জিত হয়েছিলুম, তেমনি রোমাঞ্চিতও হয়েছিলুম কবির স্নেহমাধুর্যে। আমরা প্রথম যেদিন চ'লে যাওয়ার প্রস্তাব করলাম কবি বললেন, 'না, যেয়ো না। কলকাতায় এখন বড্ড গরম, ছুটি তো আছে, এখানে উপভোগ করো।' আমরা আসাতে তিনি যে সত্যি খুশি হয়েছেন সেটা বারে-বারেই ফুটেছে এমনি নানা ছোটো-ছোটো কথায় ও ঘটনায়। অবাক লেগেছে আমাদের, যে-আনন্দের ঢেউ মনে লেগেছে তা অনির্বচনীয়। এ যেন বিশ্বাস করা শক্ত। তাঁকে কোনো আনন্দ দিতে পারি এমন-কোনো যোগ্যতাই আমাদের নেই, আমরাই তাঁর কাছ থেকে দু' হাতে লুঠ ক'রে নিয়েছি যা পেরেছি। তিনি অকৃপণ হাতে দিতে ভালোবাসেন, দিতে পেরেছেন ব'লেই খুশি হয়েছেন। কবি ব'লে তাঁকে ভালোবেসেছি চিরকাল, গুরু ব'লে তাঁকে মেনেছি, তাঁর মধ্যে পেয়েছি জীবনের ভিত্তি; কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর যে-স্নেহস্পর্শ এবার পেলাম তার স্মৃতি মন থেকে মিলোবে না যতদিন বেঁচে আছি।

'মধুময় পৃথিবীর ধূলি'

কৃপালানি একদিন বলছিলেন যে গুরুদেবের বয়েস যত বাড়ছে তিনি ততই secular হচ্ছেন। কথাটা ভেবে দেখবার মতো। পিতার কাছে তিনি যে-ধর্মশিক্ষা পেয়েছিলেন সেটা পোশাকি ব্যাপার নয়, সেটা ফলেছে তাঁর জীবনে। মনে-প্রাণে তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী। তাঁর ধর্মসংগীত আন্তরিক আবেগে পরিপূর্ণ। এককালে রীতিমতো হিন্দু ছিলেন, গভীরভাবে ব্রাহ্মণ ছিলেন, প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানও নাকি বাদ দিতেন না—সেটা দেখতে পাই গোরা চরিত্রে প্রতিফলিত, আর 'আত্মশক্তি' 'ভারতবর্ষ' এ-সব গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীতে। তাঁর ধার্মিকতার চরম উন্মীলন হ'লো 'খেয়া'-নৈবেদ্য' আর 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'তে, তার মূলে হয়তো ছিলো পর-পর কয়েকটি কঠিন শোকের আঘাত। জীবনের সে-পর্যায় তাঁর কেটে গেছে অনেকদিন। 'বলাকা'-'পলাতকা'-লিপিকা'য় তাঁর মানবিকতা জ্বলন্ত; 'পূরবী'-'মহুয়া'য় বাজলো প্রেমের গান—তাঁর 'মিস্টিসিজম্'-এর যাঁরা ভক্ত তাঁরা ক্রমশই হতাশ হ'তে লাগলেন। 'গীতাঞ্জলি' যে মিস্টিক ব'লেই বড়ো নয়, 'গীতাঞ্জলি' যে কাব্যহিশেবেই মহৎ এ-কথা যাঁরা মানতেন তাঁরা উল্লসিত বিস্ময়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন কবিপ্রতিভার নব-নব আভার বিচ্ছুরণ। আজ মৃত্যুর কাছে এসে তিনি সম্পুর্ণরূপে পার্থিব। একদিন সোনার তরী সাজিয়ে বেরিয়েছিলেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়, আজ মৃত্যুর তরী তৈরি হ'লো। তিনি প্রস্তুত, কিন্তু তিনি উৎসুক নন। এই ক্রান্তিকাল উজ্জ্বল হ'য়ে রইলো তাঁর প্রেমে। মোহানার যত কাছে আসছেন ততই গভীরভাবে ডুবছেন জীবনরসে। সকল মানুষের, সমগ্র জীবজগতের প্রেমে আজ তিনি বিভোর। অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিনা

এই প্রশ্ন ক'রে কোনো জবাব পাননি। জবাব পাওয়া যায় তিনি যখন কথাপ্রসঙ্গে উপনিষদের কোন শ্লোক আবৃত্তি করেন। তখন তাঁর সমস্ত শরীর স্থির হ'য়ে যায়, চোখ বুজে আসে, মুখে ফোটে এমন একটি জ্যোতি যার দিকে তাকাতে ভয় করে। কিন্তু এটা তাঁর মনের খুব গভীর স্তরের কথা, এটা তাঁর জীবনের ভিত্তি, আমাদের ভিত্তি যেমন রবীন্দ্রনাথ। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে তাঁর রচনায় বিশ্ববিধাতার চাইতে নরদেবতারই প্রাধান্য। 'তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো তুমি বেসেছো ভালো?' এ-প্রশ্ন তাঁর মনে জেগেছে। বিদায় নেবার আগে ডাক দিলেন তাদেরই যারা দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য ঘরে-ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে। তাঁর মুখে আজ মহামানবের জয়গান, কোনো আনুমানিক সত্য শিব সুন্দরের নয়। সত্যকে তিনি দেখেছেন জীবনে, সুন্দরকে এই জগতে, আর অশুভ-বিনাশের জাগতিক সাধনাতেই দেখেছেন শিবের বিস্ফুরণ। ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হারিয়ে অতীন্দ্রিয়কে বেশি ক'রে আঁকড়ে ধরাই হয়তো স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু হয়েছে উল্টো। প্রত্যক্ষবোধের আনন্দে তিনি আজ মগ্ন। বার্ধক্যের বিজ্ঞতা তাঁকে ছুঁলো না; বেঁচে থাকবার, ভালোবাসবার অবোধ আনন্দ তাঁর চিরকালের। কখনো তিনি লুব্ধ হলেন না ঐশ্বরিকতায় কি পারলৌকিক গাম্ভীর্যে, আজ তিনি অর্জন করেছেন শুধু আন্তরিক গভীর বিনয়ের প্রজ্ঞা। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতার মধ্যে ঈশ্বরবিষয়ক মনে করা যেতে পারে এমন রচনা কমই আছে; 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' এই তাঁর প্রথম ও শেষ মহামন্ত্র। তাঁর আধুনিক রচনায় দেখা দিয়েছে তাঁর জাত-ভাঙানো প্রিয়া—

> 'গাঁয়ের কুকুর ফেরে তোমার পাশে
> রাখালরা হয় জড়ো,
> বেদের মেয়ের মতন অনায়াসে
> টাট্টু-ঘোড়ায় চড়ো।'

সেকালের চণ্ডালিকা আর এ-কালের চাঁড়াল মেয়েকে তিনি নিয়ে এসেছেন আমাদের মধ্যে, আমরা তাদের দেখে বলেছি, 'এতদিন তোমরা

কোথায় ছিলে?' এই সাঁওতাল ছেলে, মংপুর পাহাড়িয়ার দল, নিতান্ত ঘরোয়া এই কুকুরটি, ভোরবেলার ছোট্ট চড়ুইপাখি—কোথায় ছিলো এরা এতদিন? আজ তিনি হিন্দি প্রেমের গানের অনুবাদ করছেন—'তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে-রং আছে উজ্জ্বলি' সে-রং দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচুলি'—ছোটো গল্পে আঁকছেন এমন মেয়ে প্রথাগত নীতিধর্মের চাইতে মনুষ্যধর্ম যার পক্ষে ঢের বড়ো সত্য; সমস্ত সংস্কার তাঁর একে-একে কেটে যাচ্ছে, এমন একটি মস্ত খোলা জায়গায় এসে তিনি আজ দাঁড়িয়েছেন যেখান থেকে অতি বড়ো স্খলন দেখলেও তিনি আঁৎকে ওঠেন না, ক্ষমাহীনতা ছাড়া আর সমস্ত-কিছুরই যে ক্ষমা আছে, দীর্ঘ জীবনের শেষে এই উপলব্ধি আজ তাঁর। 'শ্যামা'র অপরূপ শেষ গানটি স্মরণীয়—

'ক্ষমিতে পারিলাম না যে
        ক্ষমো হে মম দীনতা,....
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
        চরণে নব বিনতা,
        ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না,
আমার ক্ষমাহীনতা .... ।'

তাঁর এই মহান বাণী বুদ্ধের কি যীশুর বাণীর সঙ্গে তুল্য, আর কোথাও এর তুলনা নেই।

অথচ এককালে যে সমাজের গতানুগতিক সংস্কারেও তাঁর আস্থা ছিলো তার প্রমাণ 'চোখের বালি'। কথাটা ভুল বলা হ'লো, কারণ মনে-মনে সত্যি যে আস্থা ছিলো না তারও প্রমাণ 'চোখের বালি'। বলতে হয় এই যে আস্থা ছিলো না, কিন্তু সে-কথা জোর ক'রে বলবার সাহসও ছিলো না। তাই 'চোখের বালি'র মতো অত ভালো একখানা উপন্যাস শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হ'য়ে গেলো। আমাদের বলছিলেন—'তোমরা জানো না—আমরা জন্ম নিয়েছিলুম স্ত্রীলোকহীন জগতে। বাংলার বিধাতা-

পুরুষ তখনো স্ত্রীলোক গড়েননি। সতীধর্মের কী দুর্দান্ত তেজ আমরা দেখেছি—কাছে যেতে সাহস হ'তো না। তখন কি ছাই জানতুম যে সে-ও মনে-মনে আমাকেই চাইছে, ভাবছে লোকটা কাছে আসে না কেন, এলেই তো ভালো হয়।' কথাটি কৌতুকে যেমন উজ্জ্বল, কোমলতায় তেমনি স্নিগ্ধ। শুনে খুব হেসেছিলুম, কিন্তু কথাটিতে যে-ইঙ্গিত আছে তা তো রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার গল্পে উপন্যাসে স্পষ্ট হ'য়েই ফুটেছে। সাধারণত বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে লোকের রক্ষণশীলতাও বাড়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছে ঠিক উল্টো; যত বয়স বেড়েছে ততই তিনি মুক্ত হয়েছেন। যা সাময়িক, যা প্রথা-গত, যা দেশে-কালে আপেক্ষিক, যা লোকাচারের সংস্কার কিংবা ব্যবহারিক বিধি মাত্র, সে-সমস্তের উর্ধ্বে গেছে তাঁর দৃষ্টি, নীতির চেয়ে সত্যকে বড়ো ক'রে দেখেছেন, রীতির চেয়ে জীবনকে। দেখা না-দিয়েই মিলিয়ে গেলো তবু কী জ্বলন্ত, কী আশ্চর্য সত্য 'চতুরঙ্গে' ননিবালার আবির্ভাব; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে যে মরতে হ'লো সেটুকুই রবীন্দ্রনাথের হার। আজকের দিনে হ'লে এ-হার তিনি মানতেন না। কুমুও তো সেই অতীত যুগেরই মেয়ে কিন্তু 'যোগাযোগ' সম্পূর্ণ হ'লে দেখা যেতো কুমু প্রাণপণ ক'রেও সামাজিক প্রথাকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে পারলে না। আজ তিনি আর-কিছুই মানেন না, মনুষ্যধর্মের দাবি শুধু মানেন। মনুষ্যধর্মের একটি প্রধান উপকরণ প্রেম, তাকে বাদ দিলে জীবনরচনা ব্যর্থ, কিন্তু নিরন্তর সম্ভোগের অবরোধে ভালোবাসায় যে-জীর্ণতা আসে তার চমৎকার ছবি তো 'চোখের বালি'তেই দিয়েছেন, মহেন্দ্র আশার বিবাহিত জীবনের প্রথম পর্বে। আমাদের দেশের মেয়েদের ভালোবাসায় যে-অন্তিক কল্যাণকামনা, তা একদিক থেকে যেমন লালন করে তেমনি অন্যদিক থেকে দুর্বলও করে। তাঁর মনকে নাড়া দেয় সেই ভালোবাসা যা প্রেমাস্পদকে ধ'রে রাখতে চায় না, প্রেমাস্পদকে বড়ো করতে চায়, আর তার জন্য ত্যাগ করে নির্ভয়ে, দুঃখ নেয় মাথা পেতে। সোহিনীতে সেই চরিত্রবতীকে তিনি এঁকেছেন যে একদিক থেকে বাস্তবিকই খারাপ মেয়ে,

কিন্তু অন্যদিকে একটি মহৎ জীবনব্রতে যে উৎসর্গিত। সেখানেই তিনি অকুণ্ঠিত অভিনন্দন জানিয়েছেন যেখানে দেখেছেন এমন-কোনো লক্ষ্যের প্রতি নিষ্কম্প্র নিষ্ঠা, যা প্রচলিত ভালো-মন্দর বাইরে ও নিজের সুখ-দুঃখের উপরে।

প্রত্যাবর্তন

অনেক বললুম রবীন্দ্রনাথের কথা, সব বলা হ'লো না। এর মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত কথা, কিছু হয়তো তুচ্ছ কথা রইলো। তা থাক। আমার অনেক ভাগ্য তাঁর দেশে জন্মাতে পেরেছি, অতি কনিষ্ঠ হ'য়েও তাঁর সমসাময়িক হ'তে পেরেছি। তাঁর যৌবনে তাঁকে আমরা দেখলুম না, তাঁর প্রৌঢ়কাল আমাদের জন্মকাল- প্রাচীনদের মুখে সে-সব দিনের কাহিনী শুনি। আমাদের দেশে আত্মজীবনী কি স্মৃতি-কথা লেখবার প্রথা নেই, ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথেরই কয়েকটি বইয়ে সঞ্চিত রইলো তাঁর বাল্য ও যৌবনদিন। সে-সব বই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়া হবে, তাঁর মধ্যে তন্নতন্ন ক'রে খোঁজা হবে তাঁকে, নানা টুকরো নিয়ে একত্র ক'রে রচিত হবে ভবিষ্যৎ বাঙালির মানসপটে তাঁর ছবি। কিন্তু আপাতত আমরা তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারছি— এখনো পারছি। এ-সৌভাগ্যের তুলনা নেই। তাঁর মহত্ত্বের স্বাদ নেশা ধরায়। তিনি মহামানব, আজকের পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, সমস্ত ইতিহাসে এমন আর ক'জন আছেন তাঁর সঙ্গে যাঁদের তুলনা হ'তে পারে। তাঁর কাছে গেলে মনের মধ্যে প্রথম যে-ধাক্কাটা লাগে সেটা সম্মোহনের। মনে পড়ে যা-কিছু তিনি লিখেছেন, যা-কিছু তিনি করেছেন, নিঃশ্বাস যেন পড়ে না। এমন অভিভূত হ'তে হয় আর কার কাছে গেলে! আর কার মধ্যে মানব-মহিমার আস্বাদ এমন সম্পূর্ণ! তাঁকে আমরা যেটুকু দেখলুম, যেটুকু পেলুম তারই আনন্দ এ-বইটি গড়লো।

চ'লে আসার দিন রবীন্দ্রনাথকে দেখলুম রোগশয্যায়। ভাবিনি এমন দৃশ্য দেখতে হবে। বাইরে বিকেলের উজ্জলতা থেকে হঠাৎ

তাঁর ঘরে ঢুকে চমকে গেলুম। অন্ধকার; এক কোণে টেব্‌ল-ল্যাম্প জ্বলছে। মস্ত ইজিচেয়ারে অনেকগুলো বালিশে হেলান দিয়ে কবি চোখ বুজে চুপ। ঘরে আছেন ডাক্তার, আছেন সুধাকান্তবাবু। আমরা যেতে একটু চোখ মেললেন, অতি ক্ষীণস্বরে দু'একটি কথা বললেন, তাঁর দক্ষিণ কর আমাদের মাথার উপর ঈষৎ উত্তোলিত হ'য়েই নেমে গেলো। বলতে পারবো না তখন আমার কী মনে হ'লো, কেমন লাগলো। হঠাৎ প্রচণ্ড ঘা লাগলো হৃৎযন্ত্রে, গলা আটকে এলো, কেমন একটা বিহ্বলতায় তাঁর দিকে ভালো ক'রে তাকাতেও যেন পারলুম না। বাইরে এসে নিঃশ্বাস পড়লো সহজে। অমর কবি এই উজ্জ্বল আলোর চিরসঙ্গী, রুদ্ধ ঘরে বন্দী ভঙ্গুর মৃৎপাত্র।

* * * *

ফিরতি গাড়িতে ব'সে থেকে-থেকে মনে পড়লো ঐ দৃশ্য, অন্ধকার ঘরে কবির রোগশয্যা। চিরজীবী কবিকে তো দেখেছি, জরাজীর্ণ প্রাণীকেও দেখে গেলুম। অফুরান প্রাণ কী নির্মম দেহবন্ধনে আজ বন্দী। কবির চিরযৌবনের সঙ্গে জরার এ কী অসম্ভব অসঙ্গতি। সমস্ত পথ মনটা যেন স্তম্ভিত হ'য়ে রইলো—কী ভাববো ভেবে পাই না। সন্ধ্যার পরে হাওড়ায় এসে দেখি কলকাতায় ব্ল্যাক-আউট শুরু হয়েছে। সমস্ত স্টেশনে সিনেমাগৃহের অস্পষ্ট নীল আভা। অভিনব বটে, এবং সে-হিশেবে মন্দও লাগলো না। আমরা যেন কোন ছায়ালোকে ছায়ার মতো ঘুরছি, আলোর ম্লানতার সঙ্গে-সঙ্গে গোলমালও যেন কমেছে। বাড়ি এসে দেখি সেখানেও ঘরে-ঘরে আলোয় ঢাকনা-পরানো। ক্রমে সমস্ত শহরে নামলো অনালোক: অবাক হ'য়ে দেখলুম বর্ষারাত্রির ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন কলকাতা। আমরাও ফিরে এলুম আর বর্ষাও নামলো।

বাড়ি ফিরে এসে প্রথম কয়েকদিন মন আর টেঁকে না। ঘুমের সময়ে চেতন মন যেই ডুবতে শুরু করে ফিরে যাই শান্তিনিকেতনে, কলকাতা মুছে যায়। ট্র্যামের শব্দে তন্দ্রা ভেঙে চমকে উঠি—মনে হয় রতন

কুঠির হু-হু হাওয়ায় বুঝি মশারি গেলো উড়ে। মনের মধ্যে যে-সুর লেগেছে তার যেন শেষ নেই; মনে-মনে ছবি দেখি বৃষ্টি-ধোয়া প্রান্তরের, দিগন্তজোড়া শ্যামলিমার। সেই তো বৃষ্টি এলো, আমরা ওখানে থাকতে-থাকতে এলো না।

এরই মধ্যে কবির এক চিঠি এলো শান্তিনিকেতনের ও সেখানে সদ্য সমাগত বর্ষার সমস্ত সৌরভ বহন ক'রে। তিনি লিখেছেন:

কল্যাণীয়েষু,

এবারে আশ্রম থেকে তুমি অনেক ঝুড়ি বকুনি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গিয়েছ। আশা করি তার বারো আনাই আবর্জনা নয়। বাজে বকুনির বাহুল্য প্রমাণ করে খুশির প্রাচুর্যকে, সেটা নিন্দনীয় নয়। তোমাদের ক'দিন এখানে ভালো লেগেছিল। ভালো লাগা জিনিসটা ফুল ফোটার মতোই রমণীয়, সেটাতে চারদিকের লোকেরই লাভ, সেইজন্য আমরাও তোমাদের আনন্দসম্ভোগের প্রতি কৃতজ্ঞ আছি। তোমরা থাকতে-থাকতেই শরীরটা অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিল, আজ দু'দিন কিছু ভালো আছি। এখন তোমাদের শূন্যস্থান অধিকার ক'রে আছেন সুধাকান্ত, তাঁর বকুনির অভাব ঘটছে না, তা স্রোতের জলের মতন, দিনগুলিকে মার্জ্জনা ক'রে দেয়। কোনো কিছু কথা কবার না থাকলেই মনের মধ্যে কলঙ্ক পড়তে থাকে, সুধাকান্তের কলকল্লোলে তার সম্ভাবনা থাকে না। আরোগ্যশালার এ একটা উপকরণ জেনো। বাজে খবর না থাকলে জীবন অসহ্য হ'য়ে ওঠে। সে খবর যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই হোক বা সমাজের দ্বন্দ্বক্ষেত্র থেকেই হোক, বহন ক'রে আনতে সুধাকান্ত অদ্বিতীয়। এই আমার এখানকার প্রধান খবর। আশা করি তোমাদের কুলায় আনন্দকাকলীতে ভ'রে উঠেছে। আকাশে ঘন মেঘ সূক্ষ্ম বৃষ্টির জালে অবকাশকে আবৃত ক'রে আছে, এই রকম মেঘাচ্ছন্ন দিনে মন চায় সেই রকম কথার প্রবাহ যাতে বাক্য আছে বিতণ্ডা নেই, ভালো মন্দর বিচার নিয়ে বিতর্ক নেই। অলস

মুহূর্তগুলি মুচমুচে চিঁড়েভাজার মতন এসে পড়ে পাতে, জিরোতে বিলম্ব হয় না।

ওদিকে বাগানে ময়ূরটা ডেকে ডেকে উঠছে কেবল জানাতে চায় যে খুশি হয়েছি। ইতি ৪।৬।৪১

শুভাকাঙ্খী

রবীন্দ্রনাথ

গলা দিয়ে স্বদ্ধু একটা আওয়াজ বের ক'রেই ময়ূর জানাতে পারে যে সে খুশি হয়েছে, আমাদের তার জন্যে লম্বা-চওড়া বই ফাঁদতে হয়। তবে এটা বলবো যে এ-উপলক্ষ্যে ছুটির বাকি দিনগুলো কাটলো ভালো। শেষ পর্যন্ত কলকাতাতেও আমাদের বর্ষাযাপন মন্দ হ'লো না। কপাল-গুণে আমাদের মধ্যে পেয়ে গেলুম শান্তিনিকেতনের শৈলজারঞ্জনবাবুকে, যিনি এখন রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী। তাঁর অকৃপণ গীতবর্ষণ রাবীন্দ্রিক সৌগন্ধ্য ছড়িয়ে দিলে দিনে রাত্রিতে। শান্তিনিকেতন ছেড়েও শান্তিনিকেতনের হাওয়া আমাদের ছাড়লো না, বর্ষা জ'মে উঠলো রবীন্দ্রনাথের গানের পর গানে। মেঘে বৃষ্টিতে, গানে গল্পে, আর এই বইটি লেখবার আনন্দে, মধুরতায় ভ'রে গেলো ছুটির দিনগুলি। শেষ হ'য়ে এলো ছুটি, পুঁথিও ফুরুলো, এখন স্বর্গ হ'তে বিদায়।

জুন, ১৯৪১